সাধক জীবন ও নারী

অজিতানন্দ

শরৎ পাবলিশিং হাউস
১/৪ টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রকাশিকা ঃ
ছায়া চট্টোপাধ্যায়
৯/৪ টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৬৩

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীসরোজ কুমার রায়
শ্রীমুদ্রণালয়
১২, বিনোদ সাহা লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ ঃ গৌতম রায়

ভূমিকা

জীবনের মূল উপাদান চরিত্র ও কীর্তি।

জন্মক্ষণে মানুষ এক, জীবিত প্রাণীমাত্র। তার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় বিশিষ্টতা। কোন শিশু ধীর, স্থির, শান্ত কোন শিশু চঞ্চল কাঁদুনে মারখুঠে। শিশু থেকে বালক কেউ যখন যুবক, বিশিষ্টতা বেশ স্পষ্ট। নিষ্ঠা, জিজ্ঞাসা, সততা, বৈরাগ্য, একাগ্রতা, ভাবুকতা, মননশীলতা, এ সবই সাধক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। চরিত্রের আর এক লক্ষণ, কোন কোন বিষয়ে সহজাত অধিকার।

জীবনব্যাপী চেষ্টা পরিশ্রম ও অনুশীলনের ফলশ্রুতি কীর্তি। এর মূলে কাজ করে চরিত্র আর নিজেকে প্রকাশ করার আকুলতা। সাধারণ মানুষ আহার মৈথুন ও নিদ্রা নিয়ে আছে। তারজন্য কত চিন্তা উদ্যোগ আর আয়োজন। দু একজন আলাদা। তাদের খেয়ে সুখ নেই শুয়ে শান্তি নেই। চিত্রকব রূপ প্রকাশ করার আকুলতায় ছবি আঁকছেন। সুরশিল্পী সুর প্রকাশ করার আকুলতায় গান গাইছেন। সাধকের কীর্তি আত্মজ্ঞানলাভ।

বুদ্ধ, চৈতন্য ও রামকৃষ্ণ তিন যুগের তিন অবতার। এঁদের জীবনকথা প্রথমখণ্ডে আছে। সামান্য মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করলে দেখা যাবে তিন সাধকের চরিত্র একবিষয়ে বড় বিভিন্ন। বিষয়ঃ নারী। তাঁরা সকলেই মাতৃভক্ত ছিলেন এবং ধর্মপত্নীদের প্রীতির চোখে দেখতেন। পরে আত্মজ্ঞান লাভের আকুলতায় স্ত্রীদের ত্যাগ করেছিলেন। এ পর্যন্ত একরকম, এরপর ধর্মপ্রচারকালে অন্যরকম। বুদ্ধ ভুলেছিলেন যশোধরাকে, চৈতন্য মনে রেখেছিলেন লক্ষ্মী ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে আর রামকৃষ্ণ কাছে টেনেছিলেন সারদামণিকে। এ এক বিস্ময়। আর এক বিস্ময় তাঁদের কতিপয় অনুরাগিণীদের প্রতি আচরণ বুদ্ধ বিশাখাকে স্নেহের চোখে দেখতেন, চৈতন্য মাধবীকে

শ্রদ্ধার চোখে এবং রামকৃষ্ণ সারদাকে ভক্তের চোখে। বিশাখা কল্যাণরূপিণী, মাধবী ভক্তিরূপিণী, সারদা শক্তিরূপিণী।

ধর্মপত্নী ও অনুরাগিণীদের গ্রহণ করলেও, বুদ্ধ কোন মুমুক্ষু নারীকে সংধর্মে দীক্ষা দিতে আগ্রহী হননি, চৈতন্য প্রকৃতি সম্ভাষণের অপরাধে হরিদাসকে ত্যাগ করেন। এবং রামকৃষ্ণ সর্বদাই কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা বলতেন।

স্মার্তমতে নারী বিরুদ্ধশক্তি, আত্মজ্ঞান লাভের সাধনায় তাকে দূরে রাখাই ভাল। নারী অবিদ্যা। কিন্তু বৈদিক সাধনায় ব্রহ্মচর্য সিদ্ধির পর বিধান—সস্ত্রীকো ধর্ম আচরেৎ। বশিষ্ঠ দূরে রাখেন নি অরুন্ধতীকে, যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে। ঋষি ও ঋষিপত্নী একই পর্ণকুটিরে ছিলেন।

তন্ত্রমতে স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলজগৎসু। জগতের সকল নারী তাঁহার (ঈশ্বরীর) সমান। বৌদ্ধ তান্ত্রিক গুরুকরণের পর সাধনার জন্যে প্রজ্ঞা গ্রহণ করেন। প্রজ্ঞা নায়িকা এবং নায়িকা গ্রহণ বিবাহের ন্যায় সিদ্ধ। হিন্দুতান্ত্রিক অনুরূপ ভাবে ও কারণে শক্তিগ্রহণ করেন। এবং ভার্যাই শক্তিপদবাচ্য। নাস্তি ভার্য্যা সমো বন্ধু নাস্তি ভার্য্যা সমাগতিঃ। নাস্তি ভার্য্যা সমোলোকে সহায়ো।

তান্ত্রিক সাধনা বিশেষভাবে নারী নির্ভর। সে নারী ভার্য্যা হওয়াই বিধান। তিনি ভৈরবী, উত্তর সাধিকা, আনুকুল্যরূপিণী, সিদ্ধিদায়িনী। তিনি শক্তি, প্রজ্ঞা ইত্যাদি পদবাচ্যা। তিনিই মুদ্রা এবং মৈথুনে সহায়। তাঁর দেহভোগ যোগাত্ম কৌলধর্ম। তন্ত্র বলছে ঃ ন মাংসভক্ষণে দোষঃ, ন চ মৈথুনে, প্রবৃত্তি এষা ভুতানাং। প্রবৃত্তি অস্বীকার করে লাভ নেই। মেনে নাও, নিয়ে এগিয়ে চল। এগিয়ে চলাই হল মানুষের ধর্ম।

পশু দেহজীবী, মানুষ মনোজীবী। মনের এক কাজ, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি এবং কার্যকারণের অনিবার্যতার আবিষ্কার। এর

নাম বিজ্ঞান মানসিকতা। মনের আর এক কাজ, বস্তুপ্রত্যয়কে আনন্দময় রূপে উপলব্ধি করা। এভাবেই আত্মজ্ঞান লাভ ঘটে। নিবৃত্তিঃ তু মহাফলম্।

তন্ত্র একধারে বিজ্ঞান ও জ্ঞান। তন্ত্রকার বলছেন, নারীদেহভোগ এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যার বৃদ্ধির উপায় আবিষ্কার করেছি। প্রাণ সৃষ্টিকারিণী প্রজনন-পশ্বাচার রূপান্তরিত বীরাচারে। মানুষের যা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তা বীরাচারের যোগক্রিয়ায় ছন্দোবদ্ধ। এবার স্থিরৈঃ অঙ্গৈঃ তুষ্টুবান্ তনুভিঃ আত্মবশ্যৈব বিধেয় আত্মা। নারীদেহ ভোগ প্রথম কথা, আত্মজ্ঞানলাভ শেষকথা। তারজন্য যত্নশীল হও।

তন্ত্রসাধক চিত্তকে গভীর থেকে গভীরতর স্পন্দনে স্পন্দিত করলেন। চিত্তশুদ্ধি হল। এরপর তিনি মন্ত্রক্রিয়ার অনুষ্ঠানও মন্ত্রজপ করলেন। চেতনা ঊর্ধগামী হ'ল। অন্তরায় থাকায় চিৎশক্তি উর্দ্ধে গমন করে আবার ফিরে আসে। সুতরাং আরও একাগ্র হয়ে মন্ত্রজপ করছেন। জপাৎ সিদ্ধিঃ। সাধক বস্তুপ্রত্যয়কে আনন্দময়রূপে উপলব্ধি করলেন।

এমনি সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত এবং বামদেব। এই খণ্ডে এঁদের জীবনকথা আছে। অনুধাবন করলে দেখা যাবে, নারী সুধারসে তাঁদের জীবন কতখানি ভরে দিয়েছিল। রামপ্রসাদ গৃহস্থ তান্ত্রিক ছিলেন। তাঁর জননী ভগিনী জায়া নন্দিনী সবই ছিল। স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা। আর সর্বাণীর মত ভার্যা। কমলাকান্তও গৃহস্থ তান্ত্রিক ছিলেন। তাঁর জননী দুই জায়া ও এক কন্যা ছিল। কথিত আছে, তিনি দ্বিতীয়া স্ত্রীর প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। শক্তি যথার্থই তাঁর শক্তি। বামদেব ছিলেন শ্মশান ভৈরব। তাঁর ছিল জননীও ভগিনী। কথিত আছে, তিনি অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন এবং তাঁর ছিল এক অশ্চর্য ভৈরবী।

সাধক যে কোন পরাক্রান্ত রাজার মতই কীর্তিমান কিন্তু ইতিহাস

তাঁর কথা বিশেষ লেখে না। যা লেখে তাও কীর্তিকাহিনী। কীর্তির চেয়ে কর্তা মহৎ তবু তিনি উপেক্ষিত। হায়!

কার না জানতে ইচ্ছে করে, সাধকের শৈশব, কৈশোর, যৌবন কেমন করে কেটেছিল, কেমন করে তিনি সিদ্ধ হয়েছিলেন? যে সময় তিনি ছিলেন সেই সময়, যে জীবন তিনি যাপন করেছিলেন সেই জীবন, যে সব নরনারী তাঁকে সঙ্গ দিয়েছিল সেই সব নরনারী বড় ভাবায়।

তখন রামপ্রসাদকে তাঁর গানে, তাঁর চরিত কথায়, হালিশহরের আনাচে কানাচে খুঁজি, কমলকান্তকে তাঁর কবিতায়, তাঁর আত্মপরিচয়ে, অম্বিকা কালনায়, চান্নার বিশালাক্ষী মন্দিরে, বর্ধমানের কোটালহাটে খুঁজি, বামদেবকে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে সংলাপে, তারাপীঠের শ্মশানে ও মন্দিরে খুঁজি। অনেক কিছুই পাওয়া যায়।

সেইসব দিন, সেইসব জীবন, সেইসব নরনারীকে যেন দেখি, যেন তাদের কথা শুনি। গ্রন্থে তাই কখনও দৃশ্যরূপে কখনও কথকতায় ব্যক্ত করার চেষ্টা। যদি পাঠকের কিঞ্চিৎ দর্শন শ্রবণ ঘটে তাহলে পরিশ্রম সার্থক।

প্রথম খণ্ডেই নিবেদিত হয়েছে, সাধকের জীবনই আলোচ্য বিষয়। তিনি রক্তমাংসের মানুষ, সবরকম সম্ভাব্য দুর্বলতা নিয়ে জন্মেছিলেন কিন্তু সাধনায় সে সব পরিহার করে উর্দ্ধগতি হয়েছিলেন। তিনি দিব্য জীবনের অধিকারী। সে জীবনের উত্তরাধিকার আমাদের সকলের।

তথ্য ও তত্ত্ব সংগৃহীত হয়েছে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি থেকে।

(১) সাধক রামপ্রসাদ—স্বামী বামানন্দ।

(২) সাধক কমলাকান্ত—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

(৩) তারাপীঠভৈরব—শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৪) ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য—শ্রীশশীভূষণ দাশগুপ্ত।

(৫) বাংলা ও বাঙালী—শ্রী মোহিতলাল মজুমদার।

(৬) কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(৭) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী—সম্পাদনা শ্রীভবতোষ দত্ত।

(৮) পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী—শ্রীসজনীকান্ত দাস শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৯) তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত ২ খণ্ড—শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ।

অনেকক্ষেত্রে একগ্রন্থের তথ্যের সহিত আর একগ্রন্থের তথ্য মেলে না। সে সব জায়গায় বিচার বিবেচনা করে বর্জন গ্রহণ, রামপ্রসাদের জীবনকথা মূলতঃ ঈশ্বরগুপ্তের কবিজীবনী থেকে। কমলাকান্ত ও বামদেব সম্বন্ধে অনেক কথা পিতৃদেবের নিকট শুনেছি। তান্ত্রিক বহুলভাবে শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত থেকে।

[এক]

সতেরোশো কুড়ি খৃষ্টাব্দ।

বিপুলা গঙ্গায় একটি গৈরিক পালতোলা নৌকা উত্তরদিক থেকে আসছে। নৌকার মাঝিরা আর দাঁড় টানছে না, হালের মাঝি দরাজ গলায় গান শেষ করল—'পদ্মাবতী পূজা কর চান্দ সদাগর'।

এ গান মনসামঙ্গলের। রাঢ় বাঙলার মানুষজন বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল ও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ঠাকুর দালানে বসে শোনে। বারংবার শুনতে শুনতে তাদের মনে গান গেঁথে গেছে। মাঝি এবার চণ্ডীমঙ্গলের গান ধরল—'কমলেতে কমলিনী বসি বামা একাকিনী…'

কমলে-কামিনীর উপাখ্যান এইরকম। কালীদহের পদ্মবনে এক দেবী বাঁ হাতে বিশাল হাতীকে তুলে ধরে অবহেলায় গিলছেন, আবার উগরে ফেলছেন। এ দৃশ্য ধনপতি এবং শ্রীমন্ত সদাগরের স্বচক্ষে দেখা, তবু সিংহলের রাজা তাদের কথা বিশ্বাস করলেন না। মিথ্যাকথনের অপরাধে সদাগরদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হল। কমলে-কামিনী তাদের রক্ষা করতে রাজাকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন এইরূপে। কমলে কমলমুখী, কমলযুগল আঁখি। কমলিনী কমলতরঙ্গে হাতী গিলে খায়। রাজা বিস্মিত। তিনি সদাগরদের প্রাণদণ্ড রদ করলেন।

এদিকে মাঝিদের গান থেমেছে। তারা ব্যস্তহাতে পালগুটিয়ে দাঁড় টানতে বসল। পঞ্চাশ হাত দূরে কুমারহট্টের ঘাট। নৌকা ঘাটে বাঁধতে হবে।

অশ্বত্থ-বটের কোলে ঘাট শিবমন্দির। তার চূড়ার ত্রিশূল রোদে ঝক-ঝক করে। মন্দিরে নরনারীর ভিড়, তারা স্নানের পর শিবের মাথায় জল দেবে। ব্রাহ্মণ স্তোত্র পাঠ করছেন উচ্চৈঃস্বরে।

নৌকা ঘাটে ভিড়ল। নবদ্বীপবাসী কতিপয় পণ্ডিত পুঁথিপত্র বগলে নামলেন কুমারহট্ট অর্থাৎ হালি শহরের ঘাটে। এই ঘাটের

বর্ণনা মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে করেছেন। 'বামদিকে হালিশহর দক্ষিণে ত্রিবেণী। দুকূলের যাত্রীর রবে কিছুই না শুনি॥ লক্ষ লক্ষ লোক এক ঘাটে করে স্নান। বাস হেম তৈল ধেণু কেহ করে দান॥'

* * *

সুবে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ, বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে এনেছেন। দেশের মানুষ সুখে-শান্তিতে আছে। সম্পন্ন মানুষ বস্ত্র, স্বর্ণ, তৈল এবং গাভী দান করেন। দানেই সম্পদের সার্থকতা।

মুসলমানের শাসন হলেও হিন্দুরা অবাধে দেব-দেবীর পূজা করতে পারেন, চাষবাস করতে পারেন, ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারেন। আরও সুবিধা করে দিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। হিন্দুদের বেশী সংখ্যায় শাসন কাজে নেওয়া হল, জমিদার করা হল। তাঁরা রাজার মত থাকেন। দান, ধ্যান, পালাপার্বণ, যাত্রা, পাঁচালী নিয়ে জীবন প্রজাদের।

শরৎকাল। কুমারহট্ট মুখর চণ্ডীমঙ্গলের গানে। আর পালা কীর্তনে। আজকের পালা হচ্ছে আগমনী।

সন্ধ্যায় চণ্ডীমঙ্গলে চারটে মশাল জ্বলল, খোল-করতাল বাজল। আসরে উমা ও শিববেশী দুই বালক গাইছে। উমা শিবকে বলছে—'সুমঙ্গল সূত্রকরে, আইনু তোমার ঘরে, পূর্ণ বৎসর হইল সাত।'

শিব নিরুত্তর।

উমা করুণস্বরে বলল—'দূরকর অপরাধ, পূরহ মনের সাধ, মায়ের রন্ধন খাব ভাত।'

আসরে এক মায়ের দু গাল চোখের জলে ভেসে যায়। তিনি তাঁর মেয়ে অম্বিকার কিছুতেই দূরে বিয়ে দেবেন না। কাছাকাছি থাকলে মেয়েকে রেঁধে খাওয়াতে পারবেন। মন কেমন করলে খবর নিতে পারবেন। এই মা সিদ্ধেশ্বরী। তিনি রামরাম সেনের দ্বিতীয়া স্ত্রী এবং রামপ্রসাদের গর্ভধারিণী।

বৈদ্যকুলপঞ্জী অম্বষ্ঠ সম্পাদিকায় রামপ্রসাদের বংশপরিচয় হল — খলহণ্ডীয় বংশীয়ঃ হালিশহরবাসকৃৎ। তাঁরা বৈদ্য হলেও ব্রাহ্মণ। তাঁদের বংশের কয়েক পুরুষ তান্ত্রিক কুলাচারী। কৃত্তিবাস সেন তান্ত্রিক পূজা অর্চনা ও ক্রিয়াকর্মে প্রচুর অর্থব্যয় করেছিলেন, ফলে পৌত্র রামরাম সেনের বিষয়সম্পত্তি যৎসামান্যে দাঁড়িয়েছে।

* * *

দেশের অবস্থা এখন ভাল নয়। মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর শাসন কাজে চলছে চরম বিশৃঙ্খলা। ডাকাতি বেড়েছে। গৃহস্থের যা কিছু সঞ্চয় ডাকাতের হাতে তুলে দিয়েও নিস্তার নেই। রামরাম ও সিদ্ধেশ্বরী পুত্র কন্যাদের নিয়ে সশঙ্কিত। কখন কী হয় বলা যায় না। ডাকাতেরা নাকি ছেলে ধরে নিয়ে যায়।

রামপ্রসাদের মত নধর রূপবান ছেলে সচরাচর চোখে পড়ে না। গৌরবর্ণদেহ, এক মাথা কোঁকড়ানো চুল, টানাটানা চোখ, টিকলো নাক। আর ঠোঁট দুটি লাল টুকটুকে। সিদ্ধেশ্বরী যতই দেখেন ততই ভয় পান।

জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ দত্ত পরিবারের মেয়ে সিদ্ধেশ্বরী সামান্য শিক্ষিতা। কবিতার পদ লেখেন তিনি মাঝে মধ্যে। আজ সকালবেলা পুত্রের শিরচুম্বন করে বললেন—ছেলেধরা কখন যে আসে। থেকো গুরু মহাশয়ের পাশে।

—আচ্ছা। কবে পাঠশালা যাব? রামপ্রসাদ মুখ তোলে।

—শীঘ্রই। লেখাপড়া ভাল করে করবে। সিদ্ধেশ্বরী আগ্রহের গলায় বললেন।

—হাঁ। অনেক পুঁথি পড়ব। রামপ্রসাদ জোর গলায় বলল।

—বেশ। আমাকে কাব্য পড়ে শোনাবে।

এই বলে সিদ্ধেশ্বরী হাতের ধুতি রামপ্রসাদকে পরিয়ে চোখে কাজল দিলেন। তারপর একটু কাজল লেপে দিলেন গালে, যেন কারও নজর না পড়ে। শিশু হৃষ্ট মনে পুঁথি বগলে পাঠশালায় গেল।

অক্ষর পরিচয় হতে বুদ্ধিমান রামপ্রসাদের বেশী সময় লাগে না। মাসতিনেক পর অনায়াসেই বানান করে পড়তে পারে। এক বিকেলে পণ্ডিত সেন-বাড়িতে এসে বললেন—রামরাম তোমার পুত্র বিদ্বান হইবে।

অন্তরালবর্তিনী সিদ্ধেশ্বরীর বুক গর্বে ভরে গেল। তিনি ছেলেকে বুকে টেনে নিলেন—বাবা, কালী বানান করতো।

—ক য়ে আকার ল য়ে দীর্ঘ ঈ।

—লক্ষ্মী।

—ল কয়ে মূর্ধন্যষয়ে ময়ে দীর্ঘ ঈ।

—আমার সোনা ছেলে। সিদ্ধেশ্বরী পুঁথি খুলে ছেলের হাতের লেখা দেখলেন। মুক্তোর মত অক্ষর। রামপ্রসাদ পুঁথির তিনটে তালপাতা উলটে বলল—মা, এই ঢ্যাখ, কী লিখেছি। সিদ্ধেশ্বরী ধীরে ধীরে পড়লেন—কমলে কমলা তার কোমল শরীর।

রামপ্রসাদ চোখ ঝিকিয়ে বলল—কেমন হয়েছে?

—খুব সুন্দর। তা লক্ষ্মীর শরীর কোমল কেমন করে জানলি?

—এমনি করে। রামপ্রসাদ মায়ের কোলে ঘন হয়ে বসল।

আসন্ন সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে মাতাপুত্র চুপচাপ। কন্যা অম্বিকা ঠাকুর দালানে প্রদীপ দেখাল। সিদ্ধেশ্বরী ললাটে যুক্তকর স্পর্শ করলেন। প্রদীপ নিয়ে অম্বিকা ফিরলে রামপ্রসাদ পুঁথি খুলে বসল। সহসা বলল—মা, কেমন করে পদ লেখে, তুমি জান?

সিদ্ধেশ্বরী ঠোঁট টিপে হাসলেন। মায়ের হাসি রামপ্রসাদকে উৎসাহিত করে। বলল—আমাকে শেখাও।

—শেখাব কী। এই যে তুই লিখেছিস, কমলে কমলা তার কোমল শরীর, এর থেকেই তো হতে পারে। আর এক পংক্তি লক্ষ্মীকে নিয়ে লিখলেই কবিতার পদ।

—মিল দিতে হবে না?

—হবেই তো। সিদ্ধেশ্বরী বললেন—কমল চরণে শোভে মঞ্জুল মঞ্জীর।

—মঞ্জুল মঞ্জীর মানে কী ?

—মানে ? তোর দিদির পায়ে রুমু ঝুমু তোড়া বাজছে, ওই হল মঞ্জুল মঞ্জীর।

* * *

রামরাম সেন দাওয়ায় বসে তামাক খেতে খেতে ভাবছেন। তিনি কৈশোরে গ্রামের পাঠশালায় বাংলা শেখার পর টোলে সংস্কৃত শিখেছিলেন। শিখে চরক সুশ্রুত পড়েছিলেন আয়ুর্বেদ আচার্যের কাছে। রামপ্রসাদের তো পাঠশালায় পাঁচ বছর কাটল। কাব্য ব্যাকরণ ভালই শিখেছে। ওকে এবার টোলে দিতে হয়। ডাকলেন —প্রসাদ।

সকালবেলা। রামপ্রসাদ নিবিষ্ট মনে মঙ্গল কাব্য পড়ছিল, মুখ তুলে জবাব দিল—আজ্ঞে।

—শোনো।

রামপ্রসাদ ত্বরায় পিতার কাছে গেল।

রামরাম বললেন—কবিরাজি আমাদের পৈত্রিক ব্যবসা। আমার ইচ্ছা তুমি সংস্কৃত শিখে আয়ুর্বেদ পাঠ কর।

—আপনার ইচ্ছা আমি অমান্য করব না। বলে রামপ্রসাদ নত মুখে দাঁড়িয়ে রইল। রামরাম অভিজ্ঞ ব্যক্তি, বুঝলেন ছেলের ইচ্ছা আর তাঁর ইচ্ছা এক নয়। বললেন—তোমার ইচ্ছা কী ?

—এখন তো সংস্কৃত পড়ি। পরে আপনাকে আমার ইচ্ছা জানাব।

—উত্তম। রামরাম খেলো হুঁকোয় টান দিলেন।

রামপ্রসাদ ধীর পায়ে এসে দাঁড়াল মায়ের কাছে। সিদ্ধেশ্বরী বেগুন কাটতে গিয়ে থামলেন। আজ কী বার ? জিজ্ঞেস করতে রামপ্রসাদ জানাল, সোম।

রামপ্রসাদ ডাকল—মা।

—কী ?

—আমি আয়ুর্বেদ পড়ব না।

—তা তোর বাবাকে বল। আমি কী করব ?

—তুমিই তো সব। তুমিই আমার মা তারা। রামপ্রসাদ রিণ রিণে গলায় গান ধরল—'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা। আমার কেহ নাই ঈশ্বরী হেথা॥ মা'র সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা তথা।'

সিদ্ধেশ্বরী হাসলেন—পাগল ছেলে।

রামপ্রসাদ গাইতে গাইতে গৃহ সংলগ্ন উদ্যানে গেল।

* * *

উদ্যানে আম জাম কাঁঠাল গাছই বেশী। একটি বকুলগাছের তলায় বেদী। দোআঁশ মাটির। বর্ষায় ক্ষয়ক্ষতি হলেও নিত্য গোবর লেপার জন্য টি'কে আছে।

রামপ্রসাদ বেদীটির উপর জুৎ করে বসল। গাছে প্রচুর আম ধরে থাকলেও ভাবুক প্রকৃতির কিশোর সেদিকে মন দিল না। হাতের চণ্ডীমঙ্গল খুলে পড়তে থাকে—'পর্বত কন্দরে বসি, নাহি পাট পড়সী, সীমন্তে সিন্দুর দিতে সখী। একদিন কোথা যাই, যুড়াইতে নাহি ঠাঁই, বিধি মোরে কৈল জন্মদুঃখী।'

রামপ্রসাদ পর্বতবাসিনী উমার দুঃখে উদাস হয়ে যায়। তরুমর্মর, আলোছায়া, ঘুঘুর ডাক উদাসভাবকে তীব্র করে। তখন দিদিকে দেখে কিশোরের মনে ভাব এল। গায়—'গিরিবর, আমি পারিনে হে. প্রবোধ দিতে উমারে। কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি, মায়ে ইহা সহিতে কি পারে।'

ভবানী অবাক হয়ে ভাইয়ের গান শোনে। কী আবেগ প্রসাদের, শুনলে মন জুড়িয়ে যায়। বলল—প্রসাদ, কী করে গাস ?

—এমনি।

—এ গান কোথায় পেলি ?

—কোথাও পাইনি। মনে হল।

—আর সুর ?

—কেউ শেখায় নি। খেয়াল খুশী মত গাই।

—গা, শুনি। ভবানী পাশে বসল।

প্রসাদ গায় আর ভবানী শোনে। ওর ইচ্ছা করে গলা মেলাতে, কিন্তু পারে না।

প্রসাদ আবার গান ধরল—'হর ফিরে মাতিয়া, শঙ্কর ফিরে মাতিয়া। কোটি কোটি দানব, শ্মশানে ফিরে গাইয়া।'

গান শেষ হলে ভবানী ঠোঁট ওলটাল—এটা ভাল না।

—আচ্ছা আচ্ছা তোকে একটা ভাল গান শোনাব।

—আজ থাক। ভবানী উঠল—বেলা হয়েছে, খাবি চল। মা আজ মাংস রেঁধেছে।

—মাংস কোথায় পেল?

—রক্ষাকালী তলায় বলি দেওয়া হয়েছে।

ভাই বোন হাত ধরাধরি করে বাড়ি ফিরল। দুজনই শিশুর মত সরল।

* * *

ভবানীর হবু শ্বশুরবাড়ি কলিকাতায়। হালিশহর থেকে প্রায় বিশ ক্রোশ দক্ষিণে। কলিকাতা গণ্ডগ্রাম হলেও গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ইংরেজ বণিক কুঠি বানিয়ে জোর ব্যবসা করছে। কুঠির এক বেনিয়নের লেখাপড়া জানা কর্মচারী ভবানীর স্বামী লক্ষ্মীনারায়ণ। সম্পন্ন বৈষ্ণব বাড়ির ছেলে।

বিয়ের রাতে ভবানী ঝলমল করে। দিদিকে দেখে রামপ্রসাদের মনে হল, উমা। ভাবুক কিশোর মনে মনে একটি পদ রচনা করল—'আমার উমা সামান্য মেয়ে নয়, রাজরাজেশ্বরী হয়ে, হাস্য বদনে কথা কয়।'

বিয়ের পর ভবানী শশুর বাড়ি গেল। রামপ্রসাদের মন খারাপ, কিছুই ভাল লাগে না। একা একা গঙ্গাতীরে ঘোরে, ছোটভাই বিশ্বনাথকে ধমক দেয়—তুই কেন আমার পিছু নিস্?

বিশ্বনাথ মুখ ভার করে। চোখের কোলে জল। তাই দেখে রামপ্রসাদের বুক ব্যথায় টনটন করে। ভাইকে সঙ্গে নিল।

গঙ্গাতীরে বট গাছতলায় বসলে বিশ্বনাথ কড়ি বের করল, খেলবে। রামপ্রসাদের কড়ি খেলা ভাল লাগে না, কেবলই অন্যমনস্ক হয়। কাল অষ্টমঙ্গলা, কাল দিদি আসবে।

সকালে ভবানী এল। প্রসাদ সিদ্ধেশ্বরীকে বলে—মা, দিদি এসেছে। বলতেই ওর মুখ চোখ কেমন হয়ে গেল, চোখের পলক পড়েনা। কিছুক্ষণ পর সুর করে বলল—'আজ শুভনিশি পোহাইল, ঘরে এই যে নন্দিনী আইল।'

লক্ষ্মীনারায়ণ হাসলেন—ভায়া আমার পদকর্তা।

অচিরে সেন বাড়ি কলরব মুখর হয়। প্রতিবেশী গৃহিণীরা এসেছেন, ভবানীর সইরা এসেছে। কত হাসি, কত কথা তাদের।

সংসারে দুঃখ আছে, সুখও আছে, বিরহ আছে মিলনও আছে। এই সব নিয়ে আছে সংসারী মানুষ।

* * *

রামপ্রসাদ টোলে নিয়মিত যায়। ব্যাকরণ মন দিয়ে পড়ে। পদবিভক্তি, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, কারক, সমাস, কৃৎপ্রত্যয়, তদ্ধিত প্রত্যয় কিছুই শেখার বাকী রইল না। শুদ্ধ অশুদ্ধের বিচারবোধ হলে ও ভাবে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, বিশেষ্যের অধীন বিশেষণ, এক, দুই, বহু তিনটি বচন। আমি উত্তম পুরুষ, তুমি মধ্যম পুরুষ। এই সব বিধান বড় তাৎপর্যময় মনে হয় রামপ্রসাদের। ও গভীর ভাবে চিন্তা করে অব্যয় বেশ পদ, সম্প্রদানের আলাদা বিভক্তি, শব্দেরও রূপ আছে, অব্যয়ীভাব বেশ সমাস।

কাব্যপাঠে রামপ্রসাদ যে আনন্দ পায়, তার বুঝি তুলনা হয় না। কিশোর তন্ময় হয়ে কালিদাসের কুমারসম্ভব পড়েছে। ওর মনে একটুও সন্দেহ থাকে না যে, মঙ্গলকাব্যে উমার সঙ্গে শিবের বিয়ের যে বর্ণনা তা কুমারসম্ভবের বর্ণনারই অনুরূপ।

একদিন রামরাম বললেন—প্রসাদ, এবার চরক সুশ্রুত পাঠ কর।

—কাব্যপাঠ শেষ হোক। রামপ্রসাদ পা বাড়ায়।

—ওর কী শেষ আছে? কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট, বাল্মীকি, বেদব্যাস।

রামপ্রসাদ অধোবদনে দাঁড়াল।

বেলা দ্বিপ্রহর। সিদ্ধেশ্বরী রৌদ্রে ভেষজ গুল্ম শুকোচ্ছেন। বার বার উলটে না দিলে ভালমত শুকোয় না, চূর্ণ করতে অসুবিধা ঘটে। তিনি রামপ্রসাদের ম্লান-মুখ দেখলেন। ছেলের কবিরাজ হওয়ার ইচ্ছা নাই একথা তিনি কর্তাকে বলেছেন। এখন তাঁর ইচ্ছায় কর্ম।

রামরাম কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন—কবিরাজি না করলে অন্য কিছু তো করতে হবে। বিষয় সম্পত্তি এমন নেই যে বসে খাওয়া চলে। জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করতে হলে ফারসী জানা প্রয়োজন।

—আমি ফারসী শিখব।

—উত্তম।

রামরাম হালিশহরেই হিন্দী ও ফারসী শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেন। কান্যকুব্জের এক ব্রাহ্মণ কিছুকাল এখানে রয়েছেন, তাঁর হিন্দী ও ফারসীতে গভীর জ্ঞান।

প্রসাদের মনে আনন্দ ধরে না। আরও আরও কাব্য পড়তে পারছে। নূতন ভাব নূতন ভাষা।

দিনে দিনে মাস গেল বছর গেল। রামপ্রসাদ বাইশ বছরের যুবক, শরীরে যৌবনের এবং মনে কাব্যরসের জোয়ার এসেছে।

[দুই]

সতেরশো পয়তাল্লিশ খৃষ্টাব্দ। গঙ্গাতীরে স্থানে স্থানে (হালি শহরেও) নবাবের সৈন্য ঘাঁটি বসিয়েছে। বর্গীদের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখা দরকার। কলিকাতায় ইংরেজ দীর্ঘ একটি খাল কেটেছে বর্গীদের ঠেকাতে। রণতরী খালপথে টহল দিচ্ছে সারাদিন রাত। ইংরাজের কুঠি লুঠতরাজ করা খুব কঠিন। ফলে গ্রামবাংলা লুঠ হচ্ছে।

রামপ্রসাদের বিবাহের দিন স্থির। গাত্র হরিদ্রার আয়োজন চলছে। নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর থেকে বস্ত্র আভরণ এবং বিবিধ তৈজসপত্র এসেছে গতকাল। চন্দননগরে পট্টবস্ত্র এবং গন্ধদ্রব্য অপেক্ষাকৃত সুলভ কিন্তু রামরাম সেন রক্ষণশীল প্রকৃতির মানুষ, সাবেক ব্যবস্থাই রাখলেন।

বিবাহ উপলক্ষে জোড়াসাঁকো থেকে শ্যালক চূড়ামনি দত্ত এলেন। অম্বিকা ও ভবানী দু কন্যাকেও আনা হল। ভবানীর কোলে একটি পুত্র সন্তান। জগন্নাথ বড়মামার কাঁধে চড়ে ঘোরে।

রামপ্রসাদ শিশুদের বড় ভাল বাসেন। এই ভালবাসার ভেতর দিয়েই তাঁর এক বিচিত্র অনুভূতি হয়। শিশুর মত হাসেন, কথা বলেন, ছোটাছুটি করেন। আর শিশু জগন্নাথও তেমনি; মামাকে পেলে আনন্দে আত্মহারা।

ভবানী তাঁর সন্তানকে রামপ্রসাদের কাছ থেকে নিলে জগন্নাথ কান্না জুড়ে দিল। রামপ্রসাদ অমনি স্বরচিত গীত ধরলেন—'মা, হওয়া কি মুখের কথা, যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা।'

এমন মন মাতানো সুর যে সকলে হাতের কাজ ফেলে গান শোনে। বৈমাত্রেয় দাদা নিধিরাম বললেন—কেত্তনের চেয়ে এ সুর ভাল। জোর আছে। কাল কেত্তনের জন্য দুটো গান লিখে দিবি?

রামপ্রসাদ মাথা হেলিয়ে দিলেন। দেবেন।

শুভদিনে বাড়িতে শাঁখ বাজল, মেয়েরা উলু দিল। পালকি চড়ে রামপ্রসাদ বিয়ে করতে গেলেন। বাইশ বছরের স্বাস্থ্যবান্ যুবক, এবং রূপবান পুরুষ। বিয়ে বাড়িতে যুবতীগণ কনের সৌভাগ্যে ঈর্ষা করে। এমন স্বামী হাজারে একটা মেলে কিনা সন্দেহ।

অগ্নিসাক্ষী করে বেদমন্ত্র পড়ে রামপ্রসাদের সঙ্গে সর্বাণীর বিয়ে হল। তিনি বললেন—যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম।

সুমঙ্গল সূত্রকরে সর্বাণী সেন-বাড়িতে এলেন। কুলগুরু মাধবাচার্য দীক্ষা দিলেন দম্পতিকে। এখন থেকে উভয়ে মিলিতভাবে ধর্মাচারণ করবে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুঃবর্গ।

* * *

একটি বিশ্বাসকে অবলম্বন করে ধীরে ধীরে যে মানসিকতার সৃষ্টি হয়, তাই মানুষের ধর্ম। বাল্যকাল থেকে রামপ্রসাদের বিশ্বাস, ভালমন্দ খেয়ে আর নামী দামী কাপড় পরে সুখ আছে আবার নাই, কারণ ওতে না মেটে সাধ না পুরে আশা। সুখের জল নিমেষে শুকিয়ে যায়।

বিয়ের পর রামপ্রসাদ মাস কয়েক সর্বাণীকে নিয়ে ভুলে রইলেন। দিনে শতবার দেখা, রাত জাগরণে যায়। দুজনে গভীর সুখে সুখী, এত সুখ বুঝি স্বর্গেও নেই। নববধূর প্রেমকথা অমৃত সমান।

তারপর এক বাদল রাতে ঘণ্টা বাজল। ঢং ঢং ঢং। বারিবর্ষণের বিপুল শব্দ হলেও রামপ্রসাদ শুনতে পেলেন। সকলেই পায়। উনি সাধারণ মানুষের মত ভয় পেলেন না, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ন্যায় অধীর চঞ্চল হলেন। সর্বাণীর নিদ্রিত হাতটি সরিয়ে উঠে এলেন দরজার কাছে। গুণ গুণ করে গাইছেন—'তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন, ওরে আমার শুয়াপাখী। আমারি অন্তরে থেকে, আমাকে দিতেছ ফাঁকি।'

অব্যক্ত ব্যথায় রামপ্রসাদের বুক টন টন করে। তাঁর মনে হল,

শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, ঘরে বাতাস নেই। আকাশ তলে দাঁড়ালেন। বৃষ্টিতে তাঁর শরীর ভিজে যায়। তিনি আবার গান ধরলেন —'কালীনাম জপিবার তরে, তোরে রেখেছি পিঞ্জরে পুরে, মন ও তুই আমাকে বঞ্চনা করে, অরিসুখে হইলি সুখী।'

গানের ভেতর দিয়ে প্রসাদ অনুভব করলেন, বুকে ব্যথা নেই, অঙ্গ ও শীতল। তিনি ইষ্ট নাম জপ করতে করতে নিজ কক্ষে ফিরে এলেন।

সর্বাণীর ঘুম ভেঙে গেল। অবাক। এত রাতে স্বামী কোথায় গিয়েছিলেন? তিনি প্রশ্ন না করে আঁচল দিয়ে মাথা মুছে দিলেন। বস্ত্র পরিবর্তন হলে বললেন—ঘাটে গিয়েছিলে?

—না।

—তবে?

—ঘণ্টাধ্বনি শুনে আমার অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল, তাই স্নান করলাম।

সর্বাণী দ্বিতীয় বার অবাক হলেন—ঘণ্টাধ্বনি?

—হাঁ। ঘণ্টাধ্বনি। আর কিছু আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না।

সর্বাণী প্রদীপের আলোয় স্বামীর চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি দেখে তৃতীয়বার অবাক হলেন।

* * *

রামরাম সেন শ্লেষ্মার অতিযোগ হেতু কাতর। বাসকারিষ্ট সেবনের পর পুত্রকে বললেন—প্রসাদ, তুমি একবার মৃত্যুঞ্জয় সাধুর বাড়ি যাও। কিঞ্চিৎ পাওনা আছে, লইয়া আইস।

—তিনি কি আমাকে দিবেন?

—নিশ্চয় দিবে। তুমি যাও।

—আপনি বরঞ্চ একটি পত্র লিখিয়া দিন।

রামরাম চিঠি লিখে পুত্রের হাতে দিলেন।

প্রসাদের এসব কাজ ভাল লাগে না তবু চলেছেন। পিতার আদেশও বটে অর্থের প্রয়োজনও বটে।

সাধু বড়ই কৃপণ, হাত দিয়ে মুদ্রা গলে না। রামপ্রসাদকে বললেন—সামান্য পাঁচনবড়ির জন্য এক রৌপ্য মুদ্রা। অসম্ভব। আপনি যান, আমি কবিরাজ মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিব।

রামপ্রসাদ শূন্য হাতে বাড়ি ফিরলেন। তাঁর কথা শুনে রামরাম বুঝলেন, প্রসাদের দ্বারা ব্যবসার কাজ হবে না। তিনি চিন্তায় পড়লেন। এ ছেলেকে নিয়ে কী করা যায়?

রামপ্রসাদ সদাই আনমনা। ভেষজ আহরণ করতে গিয়ে গভীর বিস্ময়ে লতাগুল্ম নিরীক্ষণ করেন। বিধাতার কী অপূর্ব সৃষ্টি! ফুল দেখতেই বেলা কেটে যায়। নিধিরাম কিংবা বিশ্বনাথ তাঁকে ডেকে আনে।

এভাবেই দিন যায়।

একদিন রামপ্রসাদ একাকী ঘুরতে ঘুরতে চৈতন্য ডোবার পাড়ে উপস্থিত। গ্রামবাসীর ধারণা, চৈতন্য দেবের মন্ত্রগুরু ঈশ্বরপুরীর গৃহ এই স্থানে ছিল। একবার চৈতন্যদেব গুরুর জন্মস্থান দেখতে আসেন। 'কান্দিলেন বিস্তর চৈতন্য এই স্থানে, আর শব্দ কিছু নাই ঈশ্বরপুরী বিনে। এ স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি, লইলেন বহির্বাসে বান্ধি এক ঝুলি।' তাঁর দেখাদেখি শিষ্যেরাও মাটি নিয়েছিলেন। ফলে এই ডোবা।

রামপ্রসাদের মনে পড়ে বৈষ্ণব কীর্তনের পদ—কাঁদে শচীমাতা নিমাই নিমাই, প্রতিধ্বনি বলে নাই নাই। মহাপ্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করে চলেছেন, এই দৃশ্য রামপ্রসাদের মানসপটে যতই স্পষ্ট হয় ততই তিনি বিচলিত হন। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। আর কানে সেই ঘণ্টা বাজে। ঢং ঢং ঢং। আর নয়, আর নয়, আর নয়।

*　　*　　*

শরতের শিউলি ঝরা সকাল, ফুলের গন্ধে উদ্যান সুরভিত।

রামপ্রসাদ কোমর নুইয়ে একটি হলুদবৃন্ত সাদা ফুল তুললেন।

দলগুলি গুনলেন একটি একটি করে, পাঁচ। ফুলটি ঘাসের ওপর যেমন ছিল তেমনি রেখে দিলেন। আর মাথায় গান এসে গেল—বনের পুষ্প বেলের পাতা। তারপর? গাইলেন—মাগো, আর দিব আমার মাথা। তারপর আর কিছু মাথায় আসে না। স্বভাব কবি অস্থির পদচারণা করেন।

গতানুগতিক প্রথায় বিরক্ত রামপ্রসাদের মন বড় উতলা। যেভাবে শ্যামাপূজা হচ্ছে সেভাবে পূজা করাকে পূজা বলে? তিনি এর সার্বজনীন উদার রূপ দেবেন, মানস উপাচারে পূজা করে। কালী ব্রহ্মময়ী, সুতরাং মন্দিরে প্রতিমার পায়ে ফুল বেলপাতা দিয়ে কী হবে?

রামপ্রসাদ ব্রহ্মময়ীকে মাতৃভাবে তত্ত্ব করতে অভিলাষী। আকুল হৃদয়ে, মা বলে ডাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না?

কুলগুরু মাধবাচার্য বললেন—তন্ত্রে দুই-ই আছে। বহিরাচার ও অন্তরাচার। শরীর নিগ্রহের পর মন নিগ্রহ। ষটচক্র মনেরও সাতটি ভূমি। মনকে সংযত কর।

—কেমন করে?

—অভ্যাসে। নিত্য ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে। অভ্যাসে জপ হইবে প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাসের মত জীবনের অঙ্গীভূত। আর বৈরাগ্য বিষয় হইতে যতদূর সম্ভব দূরে থাকিবে। বৈরাগ্যে মন একাগ্র হইবে।

রামপ্রসাদ গভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—বিষয়ের অর্থ কী সংসার?

—হ্যাঁ।

—জননী, জায়া, ভগিনী ত্যাগ করতে হবে?

—না। নির্জনে ইষ্টমূর্তি ধ্যান করিবে।

সেইদিনই যুবক রামপ্রসাদ উদ্যানের অতি নির্জন স্থানে দুই প্রহর ইষ্ট নাম জপ করলেন। কেবলই অন্য চিন্তা মনে আসে। তিনি মনকে একমুখী করার প্রয়াস পান।

কুলগুরুর নির্দেশমত রামপ্রসাদ জপতপ করেন। কখনও এক-প্রহর কখনও দুইপ্রহর। ধীরে ধীরে মনের অস্থিরতা কমে আসে কিন্তু একেবারে স্থির হয় না। তিনি গঙ্গাতীরে বসে গইছেন—'মনরে! তারা বলে কেন না ডাকিলাম। এ তনু তরনি ভব সাগরে ডুবালম॥ এ ভব তরঙ্গে তরি, বানিজ্যে আনিলাম। তেজিয়া অমূল্য নিধি পাপে পুরাইলাম॥ বিষম তরঙ্গ মাঝে, চেয়ে না দেখিলাম। মন ডোবে ও চরণে হেলে না বাঁধিলাম॥ প্রসাদ বলে মাগো আমি, কি কাজ করিলাম। তুফানে ডুবিল তরি, আপনি মজিলাম॥'

বেলা দ্বিপ্রহর। গঙ্গায় মহাজনী নৌকা ভেসে চলে। নৌকার সাথে ছায়াও।

রামপ্রসাদ বিভোর হয়ে গাইছেন। কোনরকম জড়তা নেই, থামাথামি নেই। ঝরণা যেমন আপনবেগে পাগলপারা ঝরে, তেমনি। স্বতঃস্ফূর্ত।

গান শেষ হলে রামপ্রসাদ শিরদাঁড়া সোজা করে শ্বাস নিলেন। বুকটা ফুলে উঠল। তিনি ধীরে শ্বাসত্যাগ করলেন। বারকয়েক এরকম করতেই আবার একটা গান মনে এল। তিনি একাগ্র হয়ে গাইলেন—'এবার আমি ভাব পেয়েছি, কালীর অভয়পদে প্রাণ সঁপেছি। ভবের কাছে পেয়ে ভাব ভবীকে ভাল ভুলিয়েছি, তাই রাগ, দ্বেষ, লোভ ত্যজে সত্বগুণে মন দিয়েছি। তারানাম সারাৎসার আত্মশিখায় বাঁধিয়াছি। সদা দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে দুর্গানামের কাচ করেছি। প্রসাদ ভাবে যেতে হবে একথা নিশ্চিত জেনেছি, লয়ে কালীর নাম পথের সম্বল যাত্রা করে বসে আছি।'

কিছুক্ষণ পর কী যেন মনে পড়ে আর রামপ্রসাদ বিচলিতবোধ করেন। তাঁর মন বলছে, তাঁকে যেতে হবে। হেথা নয় হেথা নয়।

গঙ্গাতীর থেকে রামপ্রসাদ ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরলেন। ধীর গতি।

সিদ্ধেশ্বরী তাঁর অপেক্ষাই করছিলেন, আসন পেতে খেতে দিলেন।

আহারে তেমন রুচি নেই অন্নব্যঞ্জন প্রায় সবই পড়ে রইল। সিদ্ধেশ্বরী দুধ জ্বাল দিয়ে আনলে, তিনি দুধভাত খেলেন। আর কিছু না।

রামপ্রসাদ সারাদিন ভাবের ঘোরে রইলেন। মায়ের সঙ্গে তেমন কথাবার্তা হল না। সন্ধ্যায় তিনি বললেন—মা, আমি কিছুদিন বাইরে থাকতে চাই।

—বাইরে? কোথায়?

—তা তো জানি না।

—পাগল ছেলে।

—পাগল কেন? যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকে গেলাম। তারপর যেখানে ভাল লাগল সেখানেই রইলাম কিছুদিন।

—আর পথের সম্বল?

—কালী নাম। নাম গাইলে দুমুঠো খেতে আর মাথা গুঁজতে ঠাঁই নিশ্চয় পাব।

অন্তরালবর্তিনী সর্বাণী কেঁপে উঠলেন।

* * *

কুমারহট্টের শ্মশানে যেন উৎসব। ঢাক ঢোল বাজছে ধূপ ধুনো পুড়ছে। চিতা ঘিরে অপেক্ষমান জনতা।

চিতায় অশীতিপর এক বৃদ্ধ, পদপ্রান্তে উপবিষ্টা দেবীর ন্যায় মহিমাময়ী এক যুবতী। সীমন্তে সিন্দুর পরণে পট্টবস্ত্র। ব্রাহ্মণ চিতা প্রদক্ষিণ করে মন্ত্রপাঠ করলেন, চিতা প্রজ্বলিত হল। লেলিহান সপ্ত জিহ্বা অগ্নি বৃদ্ধ ও যুবতীকে গ্রাস করে। জনতা জয়ধ্বনি দিল—সতীমাতার জয়।

রামপ্রসাদ যুগপৎ ভয়ে ও ভক্তিতে অভিভূত হলেন। তিনি কম্পিত যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করলেন—যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমো নমঃ। তাঁর মন বড়ই ব্যাকুল। তিনি শ্মশান অতিক্রম করে এলেন দ্রুতগতি। গঙ্গাতীরে এক বটবৃক্ষতলে বসলেন। গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, সতীদাহে

কল্যাণ না অকল্যাণ? তাঁর হৃদয় এতই ব্যাকুল হল যে তৎক্ষণাৎ গুরুগৃহ যাত্রা করলেন।

পথ অনেক। দিবা অবসানে পৌঁছলেন কিন্তু হায়, গুরুদেব সংজ্ঞাহীন। বৈদ্য বললেন—রক্তের ঊর্ধচাপ হেতু হৃৎপিণ্ড স্তম্ভিত। সূচিকাভরণের ব্যবস্থা হয়েছে।

রামপ্রসাদ এইমাত্র জানেন যে, বায়ু পিত্ত ও কফের অতিযোগ বহুযোগ ও মিথ্যাযোগ হেতু রোগের উৎপত্তি। হৃৎস্তম্ভনের কথা তিনি শোনেন নাই।

গুরুদেবের আয়ু ফুরিয়েছে, চিকিৎসায় উপকার হল না। তিনি মারা গেলে শোকাহত গুরুপত্নী খুবই কাঁদলেন। রামপ্রসাদের মনে এক অজানা ভয় উঁকি দিল। গুরুপত্নীকেও কী দাহ করা হবে? তিনি আর শ্মশানে গেলেন না।

রামপ্রসাদ অধিক রাত্রে বাড়ি ফিরলে জননী সিদ্ধেশ্বরী পাগলিনী প্রায় তাঁকে বক্ষে ধারণ করলেন—কোথায় ছিলি বাবা?

—গুরুগৃহে।

—খাওয়া হয়েছে?

রামপ্রসাদ মাথা নাড়লেন। তখন সিদ্ধেশ্বরী পাটকাঠি জ্বেলে যুগপৎ অন্ন ব্যঞ্জন রাঁধলেন। সর্বাণী জল ছিটিয়ে আসন পেতে দিলেন। তাঁর নিজের হাতে সূচীকর্ম করা আসন।

রাত্রে রামপ্রসাদের এক কাণ্ড। সর্বাণীকে ভয় পাইয়ে দিলেন—

—শোনো।

—আপনার পান তাম্বুল নিয়ে আসি, তারপর শুনব।

—ওসব পরে হবে। তুমি বস।

সর্বাণী বসলে রামপ্রসাদ তাঁকে নিরীক্ষণ করছেন। 'অকলঙ্ক শশিমুখী সুধাপানে সদাসুখী, তনু তনু নিরখি অতনু চমকে।' বললেন —আমি যদি মারা যাই, তাহলে তুমি কী করবে?

সর্বাণী ভয়ে কেঁপে উঠলেন। একী অলক্ষুণে কথা! ক্রন্দসী

স্বামীর পদতলে মাথা কোটেন—আপনি এরকম কথা বলবেন না, আপনি এরকম কথা বলবেন না।

*　　　　*　　　　*

কুলগুরু করোনারি থ্রম্বসিসে হঠাৎ মারা যাওয়ায় রামপ্রসাদের সাধনভজনে মহাবিপত্তি ঘটেছে। গুরু ব্যতীত যোগাভ্যাস অসম্ভব। তিনি গুরুর সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন।

যদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধিঃ ভবতি তাদৃশী। তান্ত্রিক মহাপণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ যেন রামপ্রসাদকে দীক্ষিত করতেই হালিশহরে এলেন। খ্যাতিমান সাধকের খুব নাম ডাক। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর উপদেশ শুনতে এলে তিনি বললেন—শ্যাম ও শ্যামা অভেদ। কৃষ্ণ কৃষ্ণা আনন্দের ধীমতে।

রামপ্রসাদ উপদেশ শুনে একটি গীত রচনা করলেন—'নটবর বেশ বৃন্দাবনে কালী হলে রাসবিহারী। পৃথক প্রণব নানা লীলা তব, কে বুঝে একথা, বিষম ভারি॥ নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী। ছিল বিবসন কটি, এবে পীত ধটি, এলো চুল, চূড়া বংশীধারী॥ আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছ ত্রিপুরারি। এবে নিজে কালো, তনুরেখা ভালো, ভুলালে নাগরী, নয়ন ঠারি॥ ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাস, এবে মৃদুহাস, ভুলে ব্রজকুমারী। পূর্বে শোনিত সাগরে নেচেছিলে শ্যামা, এবে প্রিয় তব যমুনা বারি॥ প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছে জননী মনে বিচারি। মহাকাল কালী, শ্যাম শ্যামতনু, একই সকল বুঝিতে নারি।'

আগমবাগীশ গান শুনে অতি পুলকিত। তিনি নির্জন উদ্যানে রামপ্রসাদকে তন্ত্রশিক্ষা দিলেন। এর পর রামপ্রসাদ শ্রীনাথ ও কৃপানাথের কাছেও তন্ত্রশিক্ষা করলেন।

এদিকে সিদ্ধেশ্বরীর চিন্তা বাড়ল। রামপ্রসাদের সংসারে মন নেই। কর্তার শরীর ভাল যাচ্ছে না। নিধিরাম কলকাতায় থাকে।

সংসারে অভাব। সর্বাণী আবার সন্তান সম্ভবা। তাঁর কত যে দুশ্চিন্তা। তা বাড়াবার জন্যই যেন রামরাম সেন মারা গেলেন।

রামপ্রসাদ নদীতে নিমজ্জিত ব্যক্তির ন্যায় বিপন্ন। সাঁতার জানেন না, মাঝদরিয়া। তিনি আকুল চিত্তে মা কালীকে ডাকেন—'আমি তাই অভিমান করি। আমায় করেছ যে মা সংসারী॥ অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি। ওমা তুমিও কোন্দল করেছ, বলিয়ে শিব ভিখারী॥'

সর্বাণী কিন্তু কোন্দল করেন না। গর্ভবতী খাওয়া কমালেন, বসন সেলাই করলেন। তেলের অভাবে দীপ নিভে গেলে অন্ধকারে বসে রইলেন।

জননী ও জায়ার করুণ দৃষ্টি সাধক রামপ্রসাদ সহ্য করতে পারলেন না। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হল। গাইছেন—'মা আমি পাপের আসামী। এই লোকসানি মহল লয়ে বেড়াই আমি॥'

করুণাঘন রামপ্রসাদ মা বউকে অভাব থেকে বাঁচাতে সঙ্কল্প করলেন। আর নয়। অর্থ উপার্জন করতে নগরে যেতে হবে। কোন নগরে যাবেন ?

রামপ্রসাদের কৃষ্ণনগর ও চন্দননগরের কথা মনে হল। মাথা নাড়লেন। উহুঁ, ওখানে নিজের লোক নেই। তার চেয়ে কলকাতাই ভাল। দাদা, মামা, ভগনীপতি আছেন।

বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নিধিরাম সেন প্রসাদকে বললেন—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঠিকাদার কৃষ্ণ মল্লিকের সহিত আমার সবিশেষ পরিচয় আছে। তাঁহার অধীনে চাকুরী করিয়া দিতে পারি। মাসিক বারো টাকা মাহিনা। এই টাকা তুমি মাকে পাঠাইবে।

এই বলে নিধিরাম স্নান করতে গেলেন। তিনি এক ধনীর সেরেস্তায় চাকুরী করেন, নাওয়া খাওয়া করে বেরোতে হবে এবার।

রামপ্রসাদ ভাইপোদের পুরাণ কাহিনী শোনান। তারা মন দিয়ে শোনে কিন্তু হাজার প্রশ্ন করে। শিশুদেরও অলৌকিক কিছু

শুনলে সন্দেহ হয়। রামপ্রসাদ বললেন—বিশ্বাস করতে শেখ।

বিকেলে বৌদি জলখাবারের সঙ্গে মিষ্টি দিলে রামপ্রসাদ অবাক। বললেন—এ কোন বস্তু?

—লেডিকেনি। বৌদি ঠোঁট ছড়ালেন—ইংরাজসাহেবের বউয়ের নামে নাম।

রামপ্রসাদ নৌকায় আসবার সময় ইংরাজসাহেব দেখেছেন কিন্তু তাদের বউ দেখেন নি। জিজ্ঞেস করলেন—ইংরাজসাহেবের বউ কেমন?

—ধবধবে সাদা।

—সরস্বতীর মতন?

—দূর! চোখ কটা চুল কটা। বেড়ালী।

রামপ্রসাদ হাসলেন। কুমারহট্টে এক বালিকা ছিল তার পিঙ্গল কেশ ও চক্ষু। ও তাকে বেড়ালী বলত।

পরদিন রামপ্রসাদ কৃষ্ণমল্লিকের বাড়ি গেলেন নিধিরামের সঙ্গে। পায়ে হেঁটেই গেলেন। পালকি চড়ার সামর্থ্য ধনীদের।

বিশাল মল্লিক বাড়ির তোরণ, হাতীও যেতে পারে। রামপ্রসাদ ও নিধিরাম তোরণ পেরিয়ে দীঘির কাকচক্ষু জলে পা ধুয়ে মন্দিরে গেলেন। শিবলিঙ্গ দেখে রামপ্রসাদ বিস্মিত। কষ্টিপাথরের নিকষ কালো আর যেমন পরিধি তেমনি উচ্চতা। নিধিরাম বললেন—ইহা অপেক্ষা বৃহৎ শিবলিঙ্গ ভূকৈলাসের রাজবাড়িতে আছে।

কৃষ্ণমল্লিক রামপ্রসাদকে শিক্ষানবীশ হিসাবে রাখার প্রস্তাব করলেন। উপযুক্ত মনে হলে চাকরীতে নিয়োগ করা হবে। একমাস আঠারোদিন রামপ্রসাদ এখানে চাকুরী করলেন। তারপর মন টিকল না।

বাগবাজারের দেওয়ান গোকুল মিত্রের বাড়িতে রামপ্রসাদের দ্বিতীয় চাকরী হল। সেরেস্তায় মুহুরীর চাকরী।

রামপ্রসাদের যা মাস মাহিনা তাতে দিনে একটাকা পড়ে। তা কম নয়। দিন এক টাকা খরচ করলে সিদ্ধেশ্বরীর সংসার দিব্যি চলে যায়।

রামপ্রসাদ কাজে মন দিলেন। দিন যায় মাস যায়, মন সরে যায়। তিনি মনিবের হিসাব খাতায় মায়ের নামগান লিখছেন। একী! রামপ্রসাদের কাণ্ডজ্ঞান নেই?

আছে আবার নেই। রামপ্রসাদের দ্বৈত সত্বা। এক সত্বা সংসারী এক সত্বা সাধক কবি। সংসারীর কাণ্ডজ্ঞান আছে সাধকের নেই।

সাধক রামপ্রসাদ বিভোর হয়ে লিখছেন ঃ

আমায় দাও মা তবিলদারি।
আমি নিমকহারাম নই, শঙ্করি ॥
পদরত্নভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার আছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি ॥
শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি।
অর্ধঅঙ্গ জায়গীর, তবু শিবের মাইনে ভারি ॥
আমি বিনা মাহিনার চাকর, কেবল চরণ ধূলার অধিকারী।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি ॥
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তোমা পেতে পারি।
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মতো পদ পাইতো সে পদ লয়ে বিপদ সারি ॥

গান লিখতে পরিশ্রম আছে কিন্তু ক্লান্তি নেই। অনুরাগ এমনি বস্তু যা শ্রমকে রমণীয় করে। গান লেখার পর প্রসাদ রমণতৃপ্তের ন্যায় সুখাসীন।

একদিন সেরেস্তায় গুঞ্জন উঠল। হ্যাঃ! আমি নিমকহারাম নই শঙ্করি। হিসাব নিকাশ ছেড়ে গান লেখা হচ্ছে আর নিমকহারাম নই। এ চলতে দেওয়া অন্যায়। দেখে শুনে চুপ করে থাকা বিপজ্জনকও বটে।

সুতরাং মনিবকে জানানো হল, রামপ্রসাদ হিসাব লেখে না, গান লেখে। মনিব বললেন—কম বয়েসে মানুষ গান একটু আধটু লেখে।

—হুজুর, একটু আধটু নয়। অনেক।

—আচ্ছা! দেখব একদিন।

দিনে দিনে বছর গেল। দেখা আর হয় না। কর্মচারীদের নালিশ বাড়ছে। মনিব রামপ্রসাদকে ডেকে পাঠালেন।

হিসাব খাতার লাল মলাট উলটে মনিব বিস্মিত। কালীনাম অষ্টোত্তর শতবার। দুর্গানাম অষ্টোত্তর শতবার। জমা খরচ। কালীনাম। জমাখরচ। দুর্গানাম। তিনি যতই পাতা ওলটান ততই বিস্ময় বাড়ে। আদায় উসুলে ভুলচুক নেই।

সাত পাতায় এসে মনিবের হাত নিস্তব্ধ। তিনি মন দিয়ে পড়ছেন—আমায় দাও মা তবিলদারি। আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী। সমস্ত গানটি একবার দুইবার তিনবার পড়লেন। তারপর কী যে হল, তাঁর দুচোখ বেয়ে শ্রাবণের ধারা। বললেন—প্রসাদ তুমি গাইতে পার?

রামপ্রসাদ মাথা নাড়লেন। পারেন।

রুদ্ধকণ্ঠে মনিব বললেন—গাও।

সমবেত কর্মচারীগণ হতবাক। বিষয়কর্মনিপুর্ণ ধনাঢ্য ব্যক্তির একী ভবাবেগ! সেরেস্তায় গান!

গান শেষ হলে মনিব বললেন—ধন্য, প্রসাদ তুমি ধন্য। তোমার প্রসাদে আমিও ধন্য।

রামপ্রসাদ দুই করতল যুক্ত করলে মনিবও দুই করতল যুক্ত করলেন—প্রসাদ, হিসাব নিকাশ যে কেউ করতে পারে কিন্তু এমন লিখতেই বা পারে কে আর এমন গাইতেই বা পারে কে? তুমি সাধক, তুমি কবি, তোমাকে এ কাজ সাজে না!

সকলে বাক্যহারা।

বিহ্বলতা কাটলে মনিব রামপ্রসাদকে বললেন—তুমি হালিশহর

ফিরে যাও। বাড়িতে বসে মায়ের নামগান কর। মাসিক তিরিশটাকা বৃত্তি পাবে।

রামপ্রসাদ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালেন। হিসাব খাতাখানি সহকর্মীকে দিতে গেলে মনিব বললেন—ওই অমূল্য ধন আমাকে দাও। যত্ন করে তুলে রাখব ঠাকুর ঘরে। আহা! কী গান।

* *

রামপ্রসাদ জোড়াসাঁকোর দোয়েহাটায় মামাবাড়ি গেলেন। মন খুব খুশী। চূড়ামণিদত্তকে গানের কথা তিনি কিছুই বললেন না। বললেন—মামা, মনিব অতি মহাশয় ব্যক্তি। আমার অভাব ও অক্ষমতা বিবেচনা করে মাসিক বৃত্তি ও মুহুরীগিরি থেকে মুক্তি দিয়েছেন। বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।

—ভাল, ভাল। বাবুর নেকনজরে যখন পড়েছ তখন আর চিন্তা নেই। চূড়ামণিও খুশী।

রামপ্রসাদ ভগিনীপতির সঙ্গেও দেখা করলেন। আবার কবে আসবেন তার ঠিক নেই। লক্ষ্মীনারায়ণকে প্রণাম করে ভবানীর পদধূলি নিলেন। মনে মনে বললেন ঃ জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী। যার পাদপদ্ম আমি রাত্রি দিবা সেবি॥

একী শুধু কাব্য কথা? না। সাধকের বহুগুণের একটি, নারীর প্রতি শ্রদ্ধা। তিনি ভগিনীর স্নেহময়ী মুখে লক্ষ্মী দর্শন করেছেন।

রামপ্রসাদ চলে যাচ্ছেন, ভবানীর চোখে জল এসে গেল। আশীর্বাদ করে বললেন—বেঁচে থাক।

—শুধু বেঁচে থাকা। রামপ্রসাদ কাতর স্বরে বললেন—আশীর্বাদ কর যেন তাঁর দেখা পাই।

—অমন আশীর্বাদ করার ক্ষমতা কী আমার আছে?

—খুব আছে। রামপ্রসাদ পদ্মাসনে বসে গান ধরলেন—'মা বিরাজে ঘরে ঘরে। এ কথা ভাঙবো কি হাঁড়ি চাতরে॥ ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে শিশু সঙ্গে কুমারী রে। যেমন অনুজ লক্ষ্মণ সঙ্গে জানকী

তার সন্নিভ্যারে। জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে। রামপ্রসাদ বলে বলব কি আর, বুঝে লওগে ঠারে-ঠোরে।'

রামপ্রসাদ বলছেন, নারী যে কী আধার তা ঠিকঠাক বুঝে নাও। বুঝে নাও মাতা, কন্যা, জায়া, ভগিনী অথবা অপর নারী সবই এক। মায়ের আধার। সুতরাং নারী নরকের দ্বার বললে মস্ত ভুল হবে। ভৈরবীর কথা মনে রেখেই তিনি বলছেন। ভৈরবীর সঙ্গে ভৈরবের সেই সম্বন্ধ, কুমারীর সঙ্গে যে সম্বন্ধ শিশুর। আরও বোঝাতে হবে? সীতার সঙ্গে লক্ষ্মণের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ। আনন্দের।

অন্য কথাও আছে। বৌদ্ধমতে নারী নরকের দ্বার—'মার' এর নিত্যসঙ্গিনী। মারকে পরাভূত করার জন্য পঞ্চ'ম'কার সাধনা। মৈথুন ও মুদ্রা, দুই'ম'কার নারীঘটিত। সে নারী ভৈরবী। বীতকাম হবার ভৈরবী—সাধনা এক বিচিত্র ব্যাপার।

এ সাধনা বাংলার মাতৃসাধকের নয়। রামপ্রসাদ বলছেন—'ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশুসঙ্গে কুমারীরে।' ভৈরব শিশুর মত মা বলতে শিখুক ভৈরবীকে, তাহলেই বীতকাম। নারী উপচার নয়, নারী আরাধ্যা। তাঁকে মা বলে ডাকলে আনন্দ, পেলে সিদ্ধি।

[তিন]

সতেরশো সাতান্ন খৃষ্টাব্দ।

ইংরাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে আলিবর্দীর মৃত্যুতে। সিরাজউদ্দৌলা বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব হয়ে নারীর সম্মান ভুললেন। মাতৃতুল্য ঘসেটিবেগমের সর্বস্ব অপহরণ করলেন, জগৎশেঠের যুবতী কন্যার সম্ভ্রম নষ্ট করতে নারী সেজে রাজ অন্তঃপুরে ঢুকলেন। ফলে ঘসেটি বিরূপ হলেন, জগৎ হলেন প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁরা ইংরাজকে মদৎ দিলেন। আরও অনেকে এগিয়ে এল। রাজবল্লভ, উমিচাঁদ। ইংরাজ সাহস পেয়ে পলাশীতে সিরাজকে

আক্রমন করলেন। প্রাণ হারালেন সিরাজউদ্দৌলা। ইংরাজের হাতে এল রাজদণ্ড।

কলিকাতায় বিজয় উৎসব সুরু হল॥ ব্যাণ্ড বাজল গড়ের মাঠে আর গড়ের নাচঘরে সুরার স্রোত বয়ে গেল। সারারাত ধরে পানভোজন ও নাচ গান চলল।

ইংরাজের অনুগত বেনিয়নরাও মজা করল। লক্ষ্মীনারায়ণের মনিব সেরেস্থার কর্মচারীদের সাতদিন ছুটি দিলেন। বাঈজী নাচের ব্যবস্থা হল বাগানবাড়িতে। পরম বৈষ্ণব লক্ষ্মীনারায়ণ শ্বশুরবাড়ি চললেন।

হালিশহর শান্ত। বিজয় উল্লাসের ঘটা সেখানে নেই। শুধু কতিপয় ব্যবসায়ী কলিকাতা থেকে মত্ত অবস্থায় ফিরে হল্লা করলেন—রুল ব্রিটানিয়া, রুল ব্রিটানিয়া।

* * *

রামপ্রসাদ গঙ্গাস্নান করতে এসে উদাত্ত গলায় গাইছেন—'মন, তুই কাঙ্গালী কিসে? ও তুই জানিস না রে সর্বনেশে॥ অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে। ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি, দেখিসরে তুই রসেবসে॥ মনের মত মন যদি হও, রাখরে যোগেতে মিশে। যখন অজপা পুনিত হবে, ধরবে না আর কাল বিষে॥ গুরুদত্ত রত্নতোড়া বাঁধরে যতনে কষে। দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি অভয়চরণ পাবার আশে॥'

তন্ত্রসাধক রামপ্রসাদ বলছেন—মন, তুমি যদি মনের মত হও (আমি যা বলব তাই করবে) তাহলে যোগে মিশে থাক।

এ এক নূতন কথা। তন্ত্র সাধনা ও যোগসাধনার সমন্বয়। বীজমন্ত্র জপ করতে করতে যখন অজপা পুনিত হবে তখন মূল প্রকৃতির 'স্বভাব' দেহাভ্যন্তরে উদ্দীপিত হয়েছে। এইবার ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণকে আবিষ্ট করে যোগে মিশে থাক। তাহলেই সিদ্ধি, আর কাল বিষে ধরবে না।

স্নান শেষ হলে সাধক রামপ্রসাদ বাড়ি ফিরলেন। অপেক্ষমানা

সর্বাণী স্বামীর আদ্রবস্ত্র ও গামছা মেলে দিলেন রোদে। রামপ্রসাদ চিরুনী দিয়ে ভ্রমরকৃষ্ণ কেশ আঁচড়ে জলযোগ করলেন। তারপর বেরোলেন ধীর পায়ে।

উদ্যানে রামপ্রসাদ মুক্ত বিহঙ্গমের ন্যায় গান গাইছেন। একটার পর একটা। জয়দেবের যেমন বৈষ্ণব পদাবলী রামপ্রসাদের তেমনি শাক্ত পদাবলী।

যখন সূর্য মধ্যগগনে, কন্যা পরমেশ্বরী ডাকতে এল। বালিকা অবিকল বাপের মত দেখতে। কপাল, ভুরু, চোখ, নাক, ঠোট চিবুক একই রকম। এমন মিল কমই দেখা যায়।

রামপ্রসাদ কন্যা পরমেশ্বরীকে দেখছেন। তাঁর মায়ের মত দেখতে তিনি এবং তাঁর মত দেখতে এই মেয়ে। জননী আর তনয়া। শুধরে নিলেন। জননী জায়া তনয়া। আদিতে জননী মধ্যে জায়া অন্তে তনয়া। সিদ্ধেশ্বরী সর্বাণী পরমেশ্বরী। আবার কন্যাকে দেখছেন। জননী থেকে তিনি, তাঁর থেকে তনয়া। সিদ্ধেশ্বরীর প্রতিচ্ছবি তিনি তাঁর প্রতিচ্ছবি পরমেশ্বরী। আবার শুধরে নিলেন। জনক জননী থেকে তিনি। রামরাম ও সিদ্ধেশ্বরীর সন্তান। জনক জননী থেকে পরমেশ্বরী। রামপ্রসাদ ও সর্বাণীর সন্তান। তাঁর সঙ্গে তাঁর বাবার, পরমেশ্বরীর সঙ্গে ওর মায়ের কিছু মিল আছেই।

রামপ্রসাদের মনে আবার কথা ঘোরে। জননী জায়া তনয়া। মা বিরাজেন সর্বঘটে। জননী ও তনয়াকে মা বলতে সবাই পারে কিন্তু জায়াকে যে মা বলতে পারে সে সিদ্ধপুরুষ।

* * *

গঙ্গারঘাটে লোক গিসগিস করছে। বৈকালীন স্নানার্থী গান শুনছেন।

রামপ্রসাদ ভাবের ঘোরে বিভোর। গাইছেন—'কেন গঙ্গাবাসী হব। ঘরে বসে মায়ের গান গাহিব॥ আপন রাজ্য ছেড়ে কেন পরের রাজ্যে বাস করিব। কালীর চরণতলে কত গত গয়া গঙ্গা দেখতে পাব॥'

কেউ লক্ষ্যই করেনি, একখানি কারুকার্য খচিত বজরা অদূরে স্থির নবদ্বীপ অধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গান শুনছেন।

কৃষ্ণচন্দ্র সেন কবি সমভিব্যাহারে মুর্শিদাবাদ চলেছেন। নৌকাতেই দুজনের বাস। রামপ্রসাদ গান করছেন—'কালো মেঘ উদয় হল অন্তর অম্বরে। নৃত্যতি মানসশিখী, কৌতুকে বিহরে॥ মা শব্দে ঘন ঘন গর্জে ধারাধরে। তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি তড়িৎ শোভা করে॥ নিরবধি অবিশ্রান্তে নেত্রে বারি ঝরে। তাহে প্রাণচাতকের তৃষাভয় ঘুচিল সত্বরে॥ ইহ জন্ম পর জন্ম বহু জন্ম পরে। রামপ্রসাদ বলে আর জন্ম, হবে না জঠরে॥'

গান শুনতে শুনতে কৃষ্ণচন্দ্র সাধুবাদ দিলেন শতবার।

রামপ্রসাদ বললেন—একদিন নবাব সিরাজউদ্দৌলা বজরায় এসেছিলেন এখানে। আমার গান শুনতে চাইলেন। কী গান গাইব? ভয়ে ভয়ে একটা গজল গাইলাম। তিনি বললেন—ও গান নয়। তখন ওই গানটা গাইলাম। তিনি তৃপ্ত হলেন।

কিছু দিন পর মহারাজের বজরা হালিশহরের ঘাটে ভিড়ল। রামপ্রসাদ বিদায় প্রার্থনা করলেন।

এখন সন্ধ্যা। দিবা রাত্রির সন্ধিক্ষণ। আকাশে আলো মাটিতে অন্ধকার। কিছু স্পষ্ট কিছু অস্পষ্ট। রাজা ও প্রজা মুখোমুখি। কৃষ্ণচন্দ্র বললেন—রামপ্রসাদ আমি তোমার পরিচয় অবগত হইয়াছি। তুমি সাধক কবি। আবার সুকণ্ঠ। তোমার গান আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। আরও শুনিতে ইচ্ছা হয়। তাই তোমাকে কৃষ্ণনগরে আমন্ত্রণ জানাই।

—কৃষ্ণনগর?

—হাঁ। রাজসভায় কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ আছেন ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর আছেন। তুমিও থাকিবে।

আগমবাগীশের নাম শুনে রামপ্রসাদের ইচ্ছা হল কিন্তু আপন

রাজ্য ছেড়ে কেন পরের রাজ্যে বাস করবেন? হালিশহর, ভিটামাটি, গৃহসংলগ্ন উদ্যানই ভাল। তা ছাড়া জননীর বয়স হয়েছে, তাঁকে ছেড়ে যাওয়া অনুচিত।

মহারাজ বললেন—কৃষ্ণনগরে তোমার কোন অসুবিধা হইবে না। উপযুক্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করিব।

রামপ্রসাদ কেঁপে উঠলেন। আবার চাকুরী! কালী ছেড়ে কৃষ্ণ-চন্দ্রের ভজনা? মাসিক তিরিশ টাকায় মা এক রকম সংসার চালাচ্ছেন, স্ত্রীরও তেমন অভিযোগ নেই। বললেন—মহারাজ, আমি অপারগ। এ স্থান ছাড়িয়া কোথাও যাইতে মন চায় না।

কৃষ্ণচন্দ্র বিরক্ত হলেন না। গুণী ব্যক্তিদের ধারাই এই, নির্লোভ নির্মোহ। বললেন—প্রসাদ, তুমি হালিশহরে থাকিয়াই সাধন ভজন কর। চৌদ্দ বিঘা নিষ্কর জমি যাহতে প্রসাদভোগ হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া গেলাম। মাঝে মাঝে তোমার গান শুনিতে হালিশহর আসিব।

সনন্দপত্রে লিখিত হল গর আবাদী জঙ্গল ভূমি আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে থাক।

* * *

সিদ্ধেশ্বরীর চোখের আলো নিভে আসছে। যখন সংসারে অভাব ঘুচছে পুত্রের খ্যাতি হয়েছে তখন তিনি মায়া কাটাবার আদেশ পেলেন। কখন যে সমনের আদেশ আসে তার ঠিক নেই।

শোকহত রামপ্রসাদ রোদন করছেন! জীবন মৃত্যুর অধীন। পিতার মৃত্যু হয়েছে। মাতারও হল। মা বাপ মরা অনাথ। পুরাতন কথা যতই মনে পড়ে ততই কাঁদেন।

পরমেশ্বরী বালিকা সুলভ কথায় রামপ্রসাদকে ভোলায়—বাবা কেঁদো না, আমি তোমার মা হব। দুধভাত দেব, যদি নাড়ু চাও তাও দেব। কেঁদো না।

রামপ্রসাদের চোখে জল ঠোঁটে হাসি। কবির মনে গানের পদ এল। গাইছেন—'মন কেনরে ভাবিস এত। যেন মাতৃহীন বালকের মত।'

সিদ্ধেশ্বরী না থাকায় সর্বাণী সংসারের কর্ত্রী কিন্তু স্বচ্ছলতার চাবিকাঠি আঁচলে বাঁধা নয়। গোলা ভরা ধান গোয়াল ভরা গাই এসব নেই। রামপ্রসাদ তেমন চাষবাস দেখাশোনা করেন না। কিছু জমি পতিত থাকে। যে জমিতে আবাদ হয় তাতে ভাল ফলন হয় না।

সাধককবি মাঠে ঘুরতে ফিরতে সবই দেখলেন। দেখার পর বিচক্ষণ গৃহস্থের মত বিঘেয় কত মন ধান হতে পারে, ফসল তছরুপ হয় কিনা, এসব ভাবলেন না! সংসারীর এক ভাবনা সাধকের আর। তাঁর ভাবনা মানবজমিন নিয়ে। তিনি একটি গান গাইলেন—

"মনরে কৃষি কাজ জান না।

এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা॥
কালীনামে দাওরে বেড়া ফসলে তছরুপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া তার কাছেতে যম ঘেঁসে না॥
অদ্য অব্দশতান্তে বা, বাজাপ্ত হবে জান না।
আছে একতারে মন এইবেলা, চুটিয়ে ফসল কেটে নে না॥
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে, ভক্তি বারি তায় সেচ না।
ওরে একা যদি না পারিস মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না॥

* * *

রামপ্রসাদের সঙ্গী তাঁর মন, যেন বন্ধু। উৎসবে, ব্যসনে দুর্ভিক্ষে শ্মশানে ও রাজদ্বারে সদা তিষ্ঠতি। মন তাঁকে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ দরবারে নিয়ে গেল! বলে—বন্ধু, এই দেখ মর্মর প্রকোষ্ঠ, নয়নরঞ্জন চন্দ্রাতপ মস্তক উপরে। উনি কে বলতো রামপ্রসাদ?

—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র।

—মনে আছে?

—আছে। তিনি আমাকে চৌদ্দবিঘা নিষ্কর জমি দিয়েছেন।

—তুমি কী দিয়েছ তাঁকে?

কুমার হট্টের উদ্যানে বসে রামপ্রসাদ উন্মনা। মহারাজকে তিনি কী দিতে পারেন? কী আছে তাঁর?

মন বলল—তুমি কবি। একটি উত্তম কাব্য লিখে দাও।

রামপ্রসাদ শঙ্খচিলের পালক দিয়ে ধীরে ধীরে লিখছেন—

'বিদ্যা সুন্দর'

অথ গণেশ বন্দনা

"পরম পুরুষ পহু পুনঃ পুনঃ প্রণমহু
পর্বতেশ পুত্রী-প্রিয় সুত।
বিভু বেদ বিদাংবর বিনায়ক বিঘ্নহর
বারণবদনগুণ গুণযুত ॥

রূপ বর্ণনার পর কৃপা প্রার্থনা। তিনি শেষ করলেন এইভাবে।

রাম রাম সেন নামে মহাকবি গুণধাম
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তৎসুত রামপ্রসাদে কহে কোকনদ পদে
কিঞ্চিৎ কটাক্ষে কর দয়া ॥"

গণেশ বন্দনা লেখার পর উঠলেন। গান লিখে যেমন আনন্দ পান তেমন আনন্দ পাচ্ছেন না, কারণ সদাই ভাবছেন মহারাজের ভাল লাগবে কী ?

সর্বাণী স্বামীকে চিন্তান্বিত দেখে বললেন—কী হয়েছে তোমার ?

—মনের অসুখ।

—বৈদ্যকে খবর দাও।

—মনের অসুখ বৈদ্য সারাতে পারবে না।

—তাহলে ?

সর্বাণীর ব্যাকুলতা ভাল লাগল কবির। তিনি প্রসন্ন চোখে পরিপূর্ণ যৌবনা স্ত্রীর দিকে তাকালেন। কুচভর নমিতাঙ্গী ভুবন-মোহনভঙ্গী। বললেন—ভয় নাই। মনের অসুখ আপনি সারে।

বলে উদ্যানে গেলেন। সরস্বতী বন্দনা আরম্ভ করলেন—

"যত্নে পুটাঞ্জলি অতি বন্দোমাতা সরস্বতী
মহাবিদ্যা সরসিজাসনী।

কুচভর নমিতাঙ্গী ভুবনমোহন ভঙ্গী
বিদ্যারূপা ব্রহ্মাণ্ড জননী ॥”

পংক্তির পর পংক্তি। দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে বিস্তারিত বন্দনা বিদ্যা-রূপা দেবীর। তুমি বিশ্ব-অন্তর্যামী, স্তব কিবা জানি আমি, বেদাগমে অতুল্য মহিমা। গানের মত স্বতঃস্ফূর্ত না হলেও ছন্দোবদ্ধ ললিত বাণী।

রামপ্রসাদ লক্ষ্মীবন্দনা আরম্ভ করলেন, বালক বয়সে রচিত পদ দিয়ে। ‘কমলে কমলা বন্দো কোমল শরীর’। প্রথম পংক্তি লিখতেই তাঁর চোখে জল এসে গেল। শৈশব স্মৃতি হৃদয় মথিত করে। জননী সিদ্ধেশ্বরী যেভাবে পদপূরণ করেছিলেন সেভাবেই লিখলেন—‘কমল চরণে শোভে মঞ্জুল মঞ্জীর’। দেবীরূপ বর্ণনা করা হলে সহসা নিজের দারিদ্র্য মনে পড়ল। লিখলেন—

“বিষম দারিদ্র্য দোষে গুণরাশি নাশে।
থাকুক আদর কেহ কথা না জিজ্ঞাসে ॥
কি আর কহিব বাড়া স্ত্রীপুত্র অবশ।
বিরসবদনে কহে বচন কর্কশ ॥
এ সর্ব তোমার মায়া জানি গো জননী।
প্রসাদে প্রসন্ন হও জলধি নন্দিনি ॥”

কবি রামপ্রসাদের গানে এ দুঃখ কেন? সর্বানী কী তাঁকে আদর যত্ন করেন না? রামদুলাল কী তাঁর অবশ? ওরা কী বিরস বদনে কর্কশ কথা বলে?

* * *

রামপ্রসাদের কালী বন্দনা আর লেখা হয় না। সর্বানী আবার সূতিকা গৃহে। তিনি একটি কন্যা প্রসব করেছেন। রামপ্রসাদের যৎ সামান্য গৃহকাজ বেড়েছে। ঘোরা ঘুরি তাঁর ভাল লাগে না। মনের দুঃখে একটি গান গাইলেন। গান বড় একটা তিনি লেখেন না। শ্রোতারা লেখেন।

বলরাম কীর্তনিয়া রামপ্রসাদের গানের মনোযোগী শ্রোতা। তিনি লিখে রাখলেন।

"মা আমায় ঘোরাবি কত
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত ॥
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত।'
তুমি কি দোষে করিলে আমায় ছ'টা কলুর অনুগত ॥
আশীলক্ষ যোনি ভ্রমি পশুপক্ষী আদি যত।
তবু গর্ভধারণ নয় নিবারণ যাতনাতে হলেম হত ॥"

বিরক্তি এমনই জিনিষ যে মনে থাকলে ভাল জিনিষও মন্দ লাগে। রামপ্রসাদের জমিজমা ঘরসংসার দারাপুত্র পরিবার আর ভাল লাগে না। তিনি দুঃখিত। ধনে জড়িয়ে থাকার এ কী দায়। কলুর বলদের মত ঘুরছেন, দুচোখ ঢাকা।

রামপ্রসাদ জগন্মাতাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হলেন। তাঁকে দেখার পর বন্দনা লিখবেন। আনমনে চেয়ে থাকেন। দিন চলে যায়। উষা মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা। রাত্রির অন্ধকারেও তিনি বিস্ফারিতনয়ন বসে থাকেন। দেখা দাও দেখা দাও।

রামপ্রসাদ অনুভব করলেন এভাবে রূপাতীতা অশেষরূপা রূপেভ্যঃ অতিরূপময়ী জগন্মাতাকে দেখা যাবে না। তন্ত্রসাধনা কৌলমতে হওয়া প্রয়োজন।

উদ্যানে রামপ্রসাদ অশ্বত্থ, বেল, আমলকী, অশোক, বট রোপন করলেন। সর্প, ভেক, শশক, শৃগাল ও নরমুণ্ড প্রোথিত করলেন। পঞ্চবটী স্থানে পঞ্চমুণ্ডী আসনে তিনি কৈবল্য সাধনায় বসলেন তন্ত্র অনুযায়ী। প্রথমে বহিরাচারে ও পরে অন্তরাচারে এই সাধনা।

সর্বাণী রইলেন তাঁর সংসারে ছেলেমেয়ে নিয়ে। পরমেশ্বরী, রামদুলাল আর জগদীশ্বরী। দুই কন্যা এক পুত্র।

* * *

এক বছর কেটেছে। রামপ্রসাদের মলিন বসন। অতি দীনভাবে

জীপনযাপন করছেন কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি ভক্তি ভরে লিখলেন বিদ্যাসুন্দর।

অথ কালীবন্দন।

কলিকাল কুঞ্জর কেশরী কালীনাম।

জপিলে জঞ্জাল যায়, যায় যোগ্যধাম॥

কাল কর পৃথক চিন্তহ মনে এই।

লকারে ঈকার দীর্ঘ খড়গ বটে সেই॥

কয়ে আকার লয়ে দীর্ঘঈ। কালী। এই নাম রামপ্রসাদ লক্ষবার জপ করে লিখলেন—নাম নিত্যা নিত্যতি নিখিল নাথ—উরে।

বিপরীত কাজলাজ পরিহরি দূরে॥

এরপর ঈশ্বরী কালীর রূপ বর্ণনা। কলম চলে না রামপ্রসাদের। অশেষরূপার রূপ কেমন? লিখলেন—কাদম্বিনী জিনিয়া নির্মল বর্ণ কালো। কলেবর-কিরণ তিমির-পুঞ্জ আলো॥

কবি বিষণ্ণ। মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা। তিনি দেখেছেন মেঘের চেয়ে নির্মল কালো রঙ? তিনি দেখেছেন শরীর-দ্যুতি অন্ধকার আলো করেছে? দেখেন নাই।

সুতরাং কালিকামঙ্গল বিদ্যাসুন্দর সম্পূর্ণ লেখা হলেও রামপ্রসাদের অতৃপ্তি থেকে যায়। মন বলল---দুঃখ পাও কেন? তুমি কবি, কাব্য রচনাই তোমার কাজ। তিনি কাতর ভাবে বললেন—আমি সাধক, মায়ের দর্শন চাই।

রামপ্রসাদ তাঁর কালিকামঙ্গল বিদ্যসুন্দর কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার দিলে, গুণগ্রাহী মহারাজ তাঁকে কবিরঞ্জন উপাধিতে ভূষিত করলেন। কথিত হল, যেখানে পরমার্থপ্রসঙ্গ সেখানে তাঁর রচনা ভারতচন্দ্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এরপর তিনি কৃষ্ণকীর্তন ও শিবকীর্তন রচনা করলেন। কালীকীর্তন রচিত হলে তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হল।

কবিপত্নী সর্বাণীর অন্তরে উল্লাস কিন্তু কবির অন্তরে বিষাদ।

কহিছে প্রসাদ দীন, বিষয় সুক্রিয়াহীন, নিজগুণে তারয় ত্রিলোক তারিনি॥'

রামপ্রসাদের মতে কাব্যরচনা কোন সুক্রিয়া নয়। জগন্মাতাকে দর্শনই একমাত্র সুক্রিয়া।

* * *

পূর্ণিমা, একাদশী, অষ্টমী, অমাবস্যা। পূর্ণশশী কলায় কলায় হ্রাস পেয়ে শূন্যশশী। তখন রজনী অন্ধকার।

রামপ্রসাদ অভুক্ত। তিনি বিশেষ তিথিগুলিতে উপবাসী ও নিদ্রাবিহীন থাকেন। সংযমী নাহলে একাগ্রতা আসে না।

পঞ্চমুণ্ডির আসনে উপবেশন করে সাধক একাগ্র হবার চেষ্টা করেন। হয় না। মৃত্যুভয় বিচলিত করে। এ কী দায়!

রামপ্রসাদ গান ধরলেন—'কালীতারার নাম জপ মুখে রে। যে নামে শমনভয় যাবে দূরে রে॥ যে নামেতে শিব সন্ন্যাসী, হইল শ্মশানবাসী।

সহসা গান থেমে গেল। সাধকের কী খেয়াল, উদ্যানত্যাগ করে শ্মশান চললেন।

এদিকে সাধ্বী সর্বাণীরও জাগরণে যায় বিভাবরী। তিনি দ্বারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, যদি স্বামীর কোন কিছুর প্রয়োজন হয়। বহিরাচারে বহু উপচার। রামপ্রসাদ চলেছেন। ভয় শেষ নাহলে তিনি শেষ। তিনি সর্বাণীকে আজ ডাকলেন না। অগত্যা সর্বাণী গৃহে ফিরলেন।

শ্মশানে রামপ্রসাদ শবের ওপর বসে মদ্যপান করলেন। তাঁর মনের বাসনা ষট্‌চক্রভেদ।

আমার মনের বাসনা জননী।
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে হ ল ক্ষ ব্রহ্মরূপিনী॥
মূলে পৃথ্বী ব, স অন্তে, চারি পত্রে মায়া ডাকিনী।
সার্ধ ত্রিবলয়াকারে, শিবে ঘেরে কুণ্ডলিনী॥
স্বাধিষ্ঠানে ব, ল অন্তে ষড়্‌দলোপর বাসিনী।

ত্রিবেণী বরুণ, বিষ্ণু, শিব ভৈরবী ডাকিনী ॥
ত্রিকোণ মনিপুরে বহ্নিবীজ ধারিণী।
ড, ফ অন্তে দ্বিদলে' শিব ভৈরবী লাকিনী ॥
অনাহতে ষট্ কোণে দ্বিষড়দল বাসিনী।
ক, ঠ, অন্তে বায়ু বীজ, শিব ভৈরবী কাকিনী ॥
বিশুদ্ধাখ্য স্বরবর্ণ, ষোড়শদল পদ্মিনী।
নাগোপরি বিষ্ণু আসন, শিব শঙ্করী সাকিনী ॥
ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে মন, শিবলিঙ্গ চক্রযোনি।
চন্দ্রবীজে সুধাক্ষরে, হ, ক্ষ বর্ণে হাকিনী ॥

রামপ্রসাদের পরিবারে পুরুষানুক্রমিক তান্ত্রিক শিক্ষাদীক্ষা। তিনি বিবাহের দিনই কুলগুরুর কাছে তন্ত্রদীক্ষিত। পরে মহাতান্ত্রিক আগমবাগীশের কাছে তন্ত্র সাধনা শেখেন। বিগত দশবছর উদ্যানে পঞ্চমকার তান্ত্রিক সাধনা করছেন নিষ্ঠাভরে। সুতরাং ষট্‌চক্রভেদ তাঁর পক্ষে দুরূহ ব্যাপার নয়। এবং অতীন্দ্রিয় অরূপ দর্শন সম্ভব।

হালিশহরে কথিত হল, রামপ্রসাদ ইষ্টদেবী দর্শন করেছেন।

*　　　*　　　*

রামপ্রসাদ সংসারী আবার সন্ন্যাসী। অর্থ নাহলে চলে না আবার পরমার্থ চাই। দুদিক সামলানো দুষ্কর। ছাড়তে হলে তিনি অর্থ ই ছাড়েন। 'কাজ কি মা সামান্য ধনে। ও কে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে ॥'

ভাগচাষী রামপ্রসাদকে ন্যায্যমত ফসলের ভাগ দেয় না, মুদি হিসাবের হেরফের করে, প্রতিবেশী ধার শোধ করে না। আর তিনি দু'হাতে অর্থ বিলিয়ে দেন। বলেন জমিজমা, প্রণামী থাকলেও অভাব।

জগদীশ্বরী ক্ষুধায় কাঁদতে সহনশীলা সর্বাণীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি স্বামীর কাছে অনুযোগ করলেন। তখন রামপ্রসাদের সংসার অসহ্য মনে হল। তিনি মনের ব্যথা ভুলতে গান ধরলেন—

ভেব দেখ মন কেউ কারো নয়, মিছে ফের ভূমণ্ডলে।

ভুল না দক্ষিণে-কালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে ॥
দিন দুই-তিনের জন্য ভবে, কর্তা বলে সবাই বলে।
আবার সে কর্তারে দিবে ফেলে, কালাকালের কর্তা এলে।
যার জন্যে মর ভেবে, সে কি সঙ্গে যাবে চলে।
সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া, অমঙ্গল হবে বলে ॥

রামপ্রসাদের যেমন স্বভাব গাইবার পর ব্যথা বেদনা ভুলে যান এদিকে পতিব্রতা সর্বাণীর মন কেমন করে। তিনি মায়াবী চোখে স্বামীর দিকে তাকালেন—তুমি কী আমার জন্যে ভেবে মর ?

—নিশ্চয়ই। তবে আমার তেমন বিষয়বুদ্ধি নাই। আর সাংসারিক কাজকর্মও তেমন ভাল লাগে না।

—একটু আধটু কাজ তো করতে পার।

—তা পারি। রামপ্রসাদ স্নেহের চোখে তাকালেন—কী করতে হবে ?

—কিছু শাকসব্জি লাগিয়েছি। যদি বেড়া ঠিক করে দাও, হবে।

রামপ্রসাদ বাঁশ, দড়ি কাটারি নিয়ে বেরোবেন, জগদীশ্বরী বলল—বাবা আমি কঞ্চি ধরব, দড়ি ফেরাব।

রামপ্রসাদ মেয়ের হাত ধরলেন। জগদীশ্বরী ওর মায়ের মত উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা ও আয়তলোচনা।

সর্বাণীর মন থেকে গান যায় নি। ভাবছেন, যার জন্যে ভেবে মর সে কি সঙ্গে যাবে চলে। সঙ্গে কেন ? আগেও তো যেতে পারে। অভিমানের গলায় বললেন—শুনছ ?

—কী ?

—আশীর্বাদ কর যেন আমি তোমার আগে মরি।

কবি রামপ্রসাদের রসজ্ঞানের অভাব নেই। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হেসে গাইলেন—যার জন্যে ভেবে মর সে কি সঙ্গে যাবে চলে। সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া অমঙ্গল হবে বলে।

সর্বাণী কেঁদে ফেললেন—কক্ষনো না। কক্ষনো না।

বাড়ির ধারে কাঠাখানেক জমি জুড়ে সব্জিক্ষেত। একদিকের বেড়া ভেঙ্গে পড়েছে। গরু ছাগল মুখ দেয় পুনকে শাকে, বেগুন চারায়।

রামপ্রসাদ নারকেল দড়ি দিয়ে কঞ্চির জোড় বাঁধছেন আর বেড়ার বাইরের দিকে বসে দড়ি ফেরাচ্ছে জগদীশ্বরী। কাজ বেশ ভালই চলছে।

শীতের সকাল। রোদ বড় মিঠা। রামপ্রসাদ গান ধরলেন—'এবার আমি করব কৃষি। ওগো, এ ভবসংসারে আসি॥ তুমি কৃপাবিন্দুপাত করিবে, বসে দেখ রাজমহিষী॥'

সর্বাণী দেখছিলেন, লজ্জা পেলেন কথা শুনে। কৃপাবিন্দুপাত। সাধকঠাকুরের মুখের আগল নেই। তিনি পালিয়ে এলেন।

মাকে ছুটতে দেখে জগদীশ্বরী দড়ি ফেলে চলে এল। রামপ্রসাদ জানতে পারলেন না। তিনি একাগ্রমনে তত্বকথা গাইছেন—'দেহজমির জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি মা সকল চষি। মাগো যৎকিঞ্চিৎ আবাদ হইলে আনন্দ সাগরে ভাসি॥'

গান চলছে, হাতের কাজও চলছে। বিরাম বিহীন। একাগ্রচিত্ত হতে পারলে কাজ আটকায় না।

কিছুক্ষণ পর জগদীশ্বরী ফিরল। অবাক। বাবা অনেকখানি বেড়া বেঁধে ফেলেছ। বলল—বাবা, তোমাকে দড়ি ফিরিয়ে দিল কে?

—তা তো জানি না। রামপ্রসাদ সদুত্তরই দিলেন।

কথিত হল, স্বয়ং ঈশ্বরী দড়ি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

সে তো বটেই। ভক্তের সহায় ভগবান্। এবং ভক্ত ও ভগবান্ অভিন্ন।

কালীভক্ত রামপ্রসাদ গেয়ে চলেছেন—'হৃদয়মধ্যেতে আছে পাপরূপী তৃণরাশি। কত দুঃখ-কাঁটা পায়ে ফোটে, মুক্ত কর মা মুক্ত কেশী॥'

জগদীশ্বরী আবার বাড়ি ছুটল—মা; মা, অবাক কাণ্ড।

বালিকা কাণ্ড ব্যক্ত করলে সর্বাণী ললাটে যুক্তকর স্পর্শ করলেন। তাঁর বিশ্বাস স্বামী সিদ্ধপুরুষ, অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী।

হায়! সকলে তেমন বিশ্বাস করে না।

* * *

হালিশহরের আজু গোঁসাই এমন একজন। তিনি রসিক পুরুষ কিন্তু রস গেঁজে যায় যদি ময়লা পড়ে। তাই হয়েছে তাঁর বেলায়।

আজু গোঁসাইয়ের রস রচনায় গাঁজলা। কারণ, ঈর্ষার ময়লা পড়েছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র দীর্ঘকাল রামপ্রসাদকে ভক্তিশ্রদ্ধা করছেন। তান্ত্রিকসাধকের এ সৌভাগ্য বৈষ্ণব আজু গোঁসাইয়ের সহ্য হয় না।

রামপ্রসাদের গান শুনতে মহারাজ হালিশহর এসেছেন। সঙ্গে গোঁসাই। তিনি কাছারি বাড়িতে বসেছেন।

সভায় রামপ্রসাদ বাহ্যজ্ঞানহীন হয়ে গান করছেন—

"ডুব দে রে মন কালী বলে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন—দু'চার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দমসামর্থ্যে একডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে॥
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি কর কুড়ায়ে পাবে, শিবযুক্তি রতন মিলে॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক-হলদি গায়ে মেখে যাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।
রতন-মানিক্য কত পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে ঝাঁপ দিলে মন, মিলবে রতন ফলে ফলে।

অস্তাচলগামী দিনমণির কিরণে দেবদর্শন রামপ্রসাদের শরীর উদ্ভাসিত। চোখমুখ ধ্যানগম্ভীর।

মহারাজ আবেগভরে বললেন—সাধু, সাধু।

কে যেন কাশলো। খুক খুক। মহারাজ দেখলেন, আজুগোঁসাই।

গোঁসাই বললেন—এবার আমি একটা গাই ?

মহারাজ মাথা হেলিয়ে দিলে আজুগোঁসাই বিদ্রূপের গান ধরলেন।

"ডুবিস্ নে মন ঘড়ি ঘড়ি।
দম আটকে যাবে তাড়াতাড়ি॥
একে তোমার কফের নাড়ী, ডুব দিও না বাড়াবাড়ি।
তোমার হলে পরে জ্বরজাড়ি, মন! যেতে হবে যমের বাড়ি॥
অতিলোভে তাঁতী নষ্ট, মিছে কষ্ট কেন করি।
ও তুই ডুবিস নে মন, ধরগে ভেসে শ্যাম কি শ্যামার চরণ তরী।"

মহারাজ কবির লড়াই শুনতে আসেন নি। ভাল লাগল না। বললেন—গোঁসাই তুমি পাগল। পাগলামি ছাড়।

বলে রামপ্রসাদের দিকে তাকালেন।

রামপ্রসাদ গোঁসাইয়ের উপর বিরক্ত। তিনি বুঝতে পারেন না গোঁসাই কেন তাঁকে ব্যঙ্গ করেন। কেন এই বিরূপতা ? তিনি শাক্ত হলেও বৈষ্ণব অনুরাগী। আর রাজ-অনুগ্রহের জন্য মোটেই সচেষ্ট নন। তবু তাঁর ওপর গোঁসাইয়ের বিদ্বেষ। লোকটা পাগল। হেসে বললেন —মহারাজ, কর্মের ঘাট, তৈলের কাট আর পাগলের ছাঁট মলেও যায় না।

আজু গোঁসাই চুপ করে থাকার পাত্র নন। ঝটিতি জবাব করলেন --কর্মের ডোর, স্বভাব চোর, মদের ঘোর মলেও ঘুচে না।

রামপ্রসাদ দুঃখ পেলেন।

* * *

কর্মের ডোর। রাত্রে রামপ্রসাদ শয্যায় ছটফট করছেন। কর্মের ডোরই বটে। আবার বন্ধন। সর্বাণী সন্তান সম্ভবা। এমন হওয়ার তো কথা নয়। তিনি উর্ধরেতা দীর্ঘদিনের সাধনায়। এবং সাধ্বী সর্বাণী সকল সন্দেহের অতীত। তবু ?

তখন সুখিনীর মত মুখ করে সর্বাণী বললেন—আমাদের দুই কন্যা

এক পুত্র। এবার পুত্রকন্যা সমান সমান হবে। জগদম্বা যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।

—হুঁ। রামপ্রসাদ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

সর্বাণী বললেন—তুমি কী সুখী নও?

—এই বয়সে সন্তান।

—পঁয়তাল্লিশ আবার বয়স নাকি?

পতিব্রতা সর্বাণী স্বামীর বুকে মাথা রাখলেন। তাঁর মনে কোন অস্বস্তি নেই কিন্তু রামপ্রসাদের আছে। প্রভাত হলে তিনি গাইছেন—

"এ সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দ বাজার লুটি॥
ওরে ক্ষিতি জল বহ্নিবায়ু, শূন্যে পাঁচে পরিপাটি॥
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটি।
যেমন সরার জলে সূর্যছায়া, অভাবেতে স্বভাব যেটি॥
গর্ভে যখন যোগী তখন—ভূমে পড়ে খেলাম মাটি।
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ি কিসে কাটি॥
রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটি।
আগে ইচ্ছাসুখে পান করে, বিষের জ্বালায় ছটফটি॥
আনন্দ রামপ্রসাদ বলে, আদ্‌পুরুষের আদ্‌ মেয়েটি।
ওমা যা ইচ্ছে হয়, তাই কর মা, তুমি তো পাষাণের বেটী॥

হালফিল আজু গোঁসাই প্রভাতকালে উদ্যানের আনাচে কানাচে ঘোরাফেরা করেন। তিনি বিদ্রূপ জুড়লেন—

"এ সংসার রসের কুটি।
হেথা খাই দাই আর মজা লুটি॥
ওরে যার যেমন মন তার তেমন ধন, মন করবে পরিপাটি॥
ওহে স্থান, নাহি জ্ঞান—বুঝ তুমি মোটামুটি।
ওরে, ভাই বন্ধু দারা সুতে, পিড়ি পেতে দেয় দুধের বাটি॥
রমণীরে বিষ ভেবেছ, তাতেও তো না দেখি ত্রুটি।

তুমি ইচ্ছাসুখে খেলে পাশা, কাঁচিয়েছ পাকা ঘুঁটি ॥

রামপ্রসাদ চীৎকার করে বললেন—চুপ কর গোঁসাই। আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও।

তবু গোঁসাই যায় না। তখন পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী বাপের হয়ে ঝগড়া করে।

পরমেশ্বরী বলল—বিশ্বনিন্দুক তুমি। বেরোও বাগান থেকে। নাহলে চেঁচিয়ে লোক জড় করব।

গোঁসাই বিদেয় হলেন।

তবু শান্তি নেই। রামপ্রসাদের, গোঁসাইয়ের বচন মনে পড়ে। কর্মের ডোর স্বভাব চোর মদের ঘোর। তিনি চিন্তা করেন, গোঁসাই স্বভাবচোর বলেছিলেন কেন? চুরি করা তাঁর স্বভাব?

সাধকের মুখে বিষাদ ছড়িয়ে যায়। তিনি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাহিনী অবলম্বন করে কালিকামঙ্গল বিদ্যাসুন্দর লিখেছিলেন, তাই কী? তিনি দৃপ্তভঙ্গীতে তাকালেন। না। তাঁর পরিচয়, কালিকামঙ্গলে নয় শ্যামাসঙ্গীতে। যারা তাঁর পেয়াদা। 'লাখ পেয়াদা রইল খাড়া, তারা আমার সাক্ষ্য দেবে।'

সন্ধ্যায় রামপ্রসাদ পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসলেন। যথারীতি সর্বাণী পানপাত্র ও সুরা রাখলেন সামনে। শত অভাবেও পতিব্রতা নারী স্বামীর তুষ্টি বিধান করছেন।

রামপ্রসাদ পানপাত্র হাতে গান ধরলেন—'সুরাপান করি না আমি, সুধা খাই জয়কালী বলে। মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে। গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে মা, আমার জ্ঞানশুঁড়িতে চুয়ায় ভাঁটি পান করে মোর মন—মাতালে।'

[চার]

সতেরশো উনসত্তর খৃষ্টাব্দ। এগারশো ছিয়াত্তর সাল। দেশে মন্বন্তর। হাজারে হাজারে বাঙলার মানুষ মরে তবু বাঙালী বেঁচে থাকে। বীরাচারী তান্ত্রিক সাধকেরা গ্রাম থেকে গ্রামে প্রচার করে, দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার। নবাবের হাতে দায়িত্ব আর কোম্পানীর হাতে ক্ষমতা, এ ব্যবস্থা চলবে না। গ্রামবাংলা জাগো, শস্য সংরক্ষণ করো, নিরন্নের মুখে অন্ন তুলে দাও।

হালিশহরের মানুষজন শাক্ত বৈষ্ণবের ঝগড়া ভুললেন। কেননা অতি ভয়াবহ পরিস্থিতি। হা-অন্ন হা-অন্ন। শাক্ত উপবাসী বৈষ্ণব উপবাসী। রামপ্রসাদ গাইলেন—'মন করো না দ্বেষাদ্বেষি। যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী॥' আজ গোঁসাই ব্যঙ্গ করলেন না। গাইলেন—'শ্যামের পদে অভেদ জেনো শ্যামা মায়ের চরণ দুটি।'

এমন দিনে সর্বাণী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। শিশু দুগ্ধাভাবে কাঁদল কিন্তু মরল না। জীবনীশক্তি মৃত্যুঞ্জয়ী। মাতা আদর করে শিশুর নাম রাখলেন মোহন। বংশের ধারা অনুযায়ী সে নাম হল রামমোহন।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ কালিকামঙ্গলে লেখা তাঁরা বংশ পরিচয় স্মরণ করে লিখলেন—জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া। মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদ ছায়া॥ শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি। শ্রীরাম দুলালে মাগো দেহি পদ ধূলি॥ শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্বজ্যেষ্ঠা সুতা। শ্রীকবিরঞ্জনে ভণে কবিতা অদ্ভুতা॥

এই পরিচয় অসম্পূর্ণ। রামপ্রসাদ নবজাতকের নাম সংযোজন করার প্রয়াস পান নি। কিন্তু কালের এমনই গতি যে রামমোহনই সেনবংশ অব্যাহত রাখেন।

রামপ্রসাদের মনে ভাব এসেছে, কাশী যাবেন। বয়সকালে এমন হয়। কথিত হল, দেবী অন্নপূর্ণা গান শোনাতে প্রসাদকে কাশী ডেকেছেন। সাধকদের সম্বন্ধে এমন রটে, কেননা সাধারণ মানুষ মনে করে, সাধক আর দেবতার বড় নিকট সম্বন্ধ।

রামপ্রসাদ কাশী যাত্রা করলেন। ত্রিবেণী এসে মন কেমন করে তাঁর। বাড়ি ফিরলেন গাইতে গাইতে—'আর কাজ কি আমার কাশী ? মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী ॥'

সর্বাণী বললেন—এত তাড়াতাড়ি ফিরলে ?

—কাশী আর গেলাম না।

—কেন ?

রামপ্রসাদ নিরুত্তর। একটু ভেবে বললেন—অন্নপূর্ণার ইচ্ছা আমি বাড়ি বসে গাই।

মাসখানেক পর রামপ্রসাদ বিষণ্ণ। ভাবছেন, গেলেই হত। গান ধরলেন—'মাগো আমার কপাল দোষী। দোষী বটে গো আনন্দময়ী। আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে, যেতে নারলাম বারাণসী। নৈলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে মোর ভাগ্যেতে একাদশী।'

একাদশী কেন ?

সাধক কবি রামপ্রসাদ হিসেব করে চলতে পারেন না। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী। পূজা পার্বণে মুক্ত হস্তে ব্যয় করেন। সর্বাণী কোনরকমেই সবদিক সামলাতে পারেন না। তাই মাঝে মাঝে উপবাস।

রামপ্রসাদ বিষয়কর্মে মন দেবার চেষ্টা করলেন। অধিকার সাব্যস্ত করা, পাওনা কড়ি বুঝে নেওয়া, ফসলের উপর নজর রাখা, মুনিষ মাহিনাদার খাটানো, পাঁচজন নিয়ে চলা কঠিন কাজ। তিনি পারেন না।

এদিকে জগদীশ্বরী বিবাহ যোগ্যা। সর্বাণী নিজের জন্যে কোন অনুযোগ করেন না কিন্তু মেয়ের বিয়ের কথা বলতেই হয়, তাই স্বামীকে বললেন।

রামপ্রসাদ কিছু জমি পরমেশ্বরীর বিয়ে দিতে বিক্রী করেছিলেন আরও কিছুটা করলেন জগদীশ্বরীর বেলায়। সালঙ্কারা কন্যা সম্প্রাদান হল। এখন তাঁর কী হবে?

প্রসাদ ভেবে পান না। গাইছেন—'দীন দয়াময়ী কি হবে শিবে। বড় নিশ্চিন্ত রয়েছ, তোমার পতিত তনয় ডুবলো ভবে। মা তোর কাশী মোক্ষধাম অন্নপূর্ণা নাম জগজ্জনে আর নাহি লবে।'

এই হল সাধকের ধারা। আরাধ্যা দেবীর কাছে দুঃখ নিবেদন করে খালাস। দেবী তখন মানবীর ওপর ভর করেন। সর্বাণী বিবাদ-মান সম্পত্তির অধিকার থেকে পাঁচজনের সহযোগিতা লাভ সবই করেন। যেন দশভুজা। দেবীরও কৃপা হয়। কৃষ্ণচন্দ্র আরও একত্রিশ বিঘা জমি দিলেন। গ্রামের সুভদ্রাদেবী দিলেন একটি বাড়ি। দর্প-নারায়ণ প্রথমে দুই বিঘা পরে আঠ বিঘা জমি দিলেন। মোট একষট্টি বিঘা জমি হওয়ায় স্বচ্ছলতা এল।

*　　　　*

রামপ্রসাদ মহাসুখে গান করেন। একটার পর একটা। শিউলি ঝরার মত অবিরল, কোকিল ডাকার মত অবিরাম।

সে গান মাঠে কৃষাণ গায়—'ইথে কি আর আপদ আছে। এই যে তারার জমি আমার দেহমাঝে। যাতে দেবের দেব সুকৃষাণ হয়ে মহামন্ত্রে বীজ বুনেছে॥' জোরালো গলার গানে প্রান্তর মুখর।

সে গান ঘাটে কৃষকবধূ গায়—'বড়াই কর কিসে গো মা। জানি তোমার আদি মূল বড়াই কর কিসে॥ আপনি ক্ষেপা, পতি ক্ষেপা, থাক ক্ষেপা সহবাসে। তোমার আদিমূল সকলই জানি, দাতা তুমি কোন্ পুরুষে॥ মাগী মিন্সে ঝগড়া করে রইতে নার আপন বাসে। মাগো তোমার ভাতার ভিক্ষা করে ফিরে কেন দেশে দেশে॥' চিকন গলার গানে পুকুর ঘাট মুখর।

সে গান নৌকার মাঝি গায়—'সামাল সামাল ডুবল তরী। আমার মনরে ভোলা, গেল বেলা, ভজলে না হরসুন্দরী॥ প্রবঞ্চনায় বিকি-

কিনি, ভরা কৈলে ভারি। যদি পার হবি মন ভবার্ণবে, মায়েরে কর কাণ্ডারী॥' নদীর দুপাড় চলমান গানে মুখর।

সে গান আম্রকাননে কিশোর গায়—'আছি তেঁই তরুতলে বসে। মনের আনন্দে আর হরিষে॥ আগে ভাঙ্গব গাছের পাতা, ডাঁটি ফল ধরিব শেষে।' কানন কচি গলার গানে মুখর।

সে গান লতাবিতানে কিশোরী গায়—'কালো বরণ ব্রজের জীবন ব্রজাঙ্গনার মন-উদাসী। হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী বাঁশী ত্যজে করে অসি।' বিতান ভীরুকণ্ঠের গানে থর থর।

সে গান প্রেমিক প্রেমিকার কানে কানে গায়—'নীল কমল-দল জিতাস্য, তড়িত জড়িত মধুর হাস্য, লজ্জিতা কুচকলি অপ্রকাশ্য, ভালে শিশুশশী। কত ছলা কত কলা, এ প্রবল চিত্তে বাসি, বামা নব্যা ভব্যা অব্যাহত-গামিনী রূপসী।' প্রেমিকার হৃদয় সরস গানে মেদুর।

সে গান চণ্ডীমণ্ডপে রামপ্রসাদ গাইছেন—'শঙ্কর পদতলে, মগনা. রিপুদলে, বিগলিত কুন্তল জাল। বিমল বিধুবর শ্রীমুখ সুন্দর তনুরুচি-বিজিত, তরুণ তমাল॥ যোগিনীগণ সকল, ভৈরব সমর করে, করে ধরে তাল। ক্রুদ্ধমানস, উর্ধে শোণিত পিবতি নয়ন বিশাল॥ নিগম সারিগম, গণ গণ মবয়ব যন্ত্র মণ্ডল ভাল। তাতা থেই থেই, দ্রিমকি দ্রিমকি ধা ধা ডম্ফ বাদ্য রসাল॥ প্রসাদ কলয়তি হে শ্যামা সুন্দরী, রক্ষ মম পরকাল। দীনহীন প্রতি, কুরু কৃপালেশ, বারয় কাল করাল॥'

রামপ্রসাদ শুধু গীতিকার নন, উচ্চশ্রেণীর গায়কও। তিনি মণ্ডপে ললিত রাগের গানগুলি তানপুরা সহযোগে সুললিত পরিবেশন করলেন। তবলা বাজল তেওট তালে। সমবেত ভদ্রমণ্ডলী সাধুবাদ দিলেন। চিকের আড়ালে উচ্চ কুলশীল নারীগণ মুগ্ধ।

সর্বাণীও। তিনি আকুল নয়নে দেখছেন। কার এমন গুণী স্বামী আছে? কার স্বামী এমন গান লিখতে পারে? এমন সুন্দর গাইতে পারে?

বাড়ি ফিরে বর্ষিয়সী সর্বাণীর এক কাণ্ড। যা এত কাল করেন নি তাই। রামমোহনকে বুকে চেপে গুণগুণ করছেন—'বিমল বিধুবর শ্রীমুখ সুন্দর।'

*　　　　*

কালস্রোতে জীবন যৌবন ভেসে যায়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বৃদ্ধ হয়েছেন। সর্বদা বিষণ্ণ। হেস্টিংসের পীড়ন, ভারত চন্দ্রের মৃত্যু, শারীরিক অসুস্থতা বড় কষ্টের। তিনি বলরাম কীর্তনিয়াকে বললেন—ফেন-চাটা প্রসাদী গান গাও।

এমন সময় কলিকাতা থেকে দূত ফিরে এলেন। রাজা সংবাদ জানতে চাইলে বললেন—হেস্টিংস আমিনী কমিশন বসিয়েছে। কালেকটারদের হাতেই রাজস্ব আদায়ের সব ভার থাকবে।

—আর কিছু ?

—ফৌজদারি বিচারের ভার নবাবের হাতে থাকবে না।

—আর কিছু ?

—মণি বেগমের কাছ থেকে হেস্টিংস লক্ষমুদ্রা উৎকোচ আদায় করেছে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নীরব। হায় মীরজাফর। তোমার বেগমকে ইংরাজ সর্বস্বান্ত করবে।

দূত বললেন—একটি সুসংবাদ আছে। সেন কবির গান কলি-কাতার সর্বত্র। দেওয়ান, মুন্সি, বেনিয়ান, বাবুদের ঠাকুরবাড়িতে প্রসাদীগানের খুব কদর।

সন্ধ্যা নামছে। দিনের কোলাহল স্তিমিত। রাজদেবালয়ে আরতি ঘণ্টা বাজে। কিছুক্ষণ পর তাও থেমে গেল। মহারাজ বললেন—ফেনচাটা গাও।

বলরাম কীর্তনিয়া গাইছেন—এমন দিন কি হবে তারা। যবে তারা তারা বলে, দুনয়নে পড়বে ধারা। অদ্ভুত কোমল কণ্ঠ, এ কণ্ঠ মহারাজ শোনেন নি। তাঁর দুচোখ বেয়ে জল পড়ে। বললেন—ফেনচাটা, আজ থেকে তুমি মধুচাটা হলে।

সহসা কৃষ্ণচন্দ্রের শরীর কেমন করে। তিনি সংজ্ঞা হারালেন। সাতদিন পর সেই মানুষটাকে আর চেনাই যায় না। রামপ্রসাদের গানে আছে : 'থাকি একখানা ভাঙা ঘরে।' সত্যিই তাই, শরীর ভাঙাঘর বই কিছু নয়।

জীর্ণকলেবর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মাকে ডাকেন।

* * *

শীতকাল। বাতাসে ক্ষুরের ধার। রামপ্রসাদ মহারাজের চেয়ে বয়েসে সামান্য ছোট। কান্তিময় এবং স্বাস্থ্যবান্। তিনি অতি তুচ্ছ খাদ্য খান, অতি সামান্য বস্ত্র পরেন। এই শীতে ভোরবেলায় স্নান করেন।

রামপ্রসাদ সিদ্ধাসনে বসে গাইছেন—'কালি ব্রহ্মময়িগো। বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোঁজতলাসি। মহাকালী কৃষ্ণ, শিবরাম, সকল আমার এলোকেশী। শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে ধর বাঁশী। ওমা রামরূপে ধর ধনু কালীরূপে করে অসি॥ দিগম্বরী দিগম্বর, পীতাম্বর চিরবিলাসী। শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুল নিবাসী॥ প্রসাদ বলে, ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি। আমার ব্রহ্মময়ী সকল ঘরে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী॥'

রামদুলাল একপলক বাবাকে দেখে কাজে গেল। বুদ্ধিমান কিশোর বিষয়আশয় ভালই দেখাশোনা করছে। বাবাকে কিছুই করতে দেয় না।

রামপ্রসাদ মুক্তি পেয়ে সুখাসীন। বাসনা কামনা মরে গেছে ভয় ভাবনা ঘুচে গেছে। আত্মনি এব আত্মনা তুষ্টঃ। তিনি একটি প্রাচীন পুঁথির পাতা ওল্টালেন।

পুঁথির ওপর চোখ রেখে রামপ্রসাদ ষড়রিপুর চিন্তা করছেন··· 'এক আসামী ছয়টা পেয়াদা······আমার ইচ্ছা করে ছটারে গরল খাইয়ে প্রাণে মারি···ছয়জনের যন্ত্রণা নিলি তাইতে পাগল গেলি ভুলি···তরঙ্গ দেখিয়া ভারি পলাইল ছয়টা দাঁড়ি···রিপু ছয়জন

ডিঙ্গা ছেড়ে গেছে চলে···ছয় দাঁড়ি গোড়ায় পা দে ডুবিয়ে দিলে···
···অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা তারা ছটা।' রামপ্রসাদের কত যে গানের লাইন মনে পড়ে।···'কাম আদি ছয়টা বলদ অহর্নিশি বহিতেছে···
দেখেশুনে ছয়টা বলদ ঘর হতে বাহির হয়েছে···ছয় দিকেতে ছয় রিপুর টান···স্থির নহে মন, ছ'জনেতে কল্লে সারা।' রামপ্রসাদ মনে করতে না চাইলেও মনে পড়ে।···'রামপ্রসাদ কয় রিপু ছয় কর জয়।'

এখন অপরাহ্ন বেলা। উদ্যানে ছায়া জমছে। ঝোপের তলায় অন্ধকার।

বৃদ্ধ রামপ্রসাদ ওষ্ঠপ্রান্তে হাসলেন। উঃ। কি দিন গেছে। ষড়রিপুর চিন্তা থাকত মন জুড়ে। রিপু কখনও বলদ কখনও কর্মনাশা। কখনও মন্ত্রণা দিয়ে ভুলোয় কখনও গোড়ায় পা দিয়ে তরী ডুবোয়। অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটারা খুব ভুগিয়েছে। তিনি নয়ন মেলে তাকালেন। দেখছেন নরনারী নদীর ঘাটে চলেছে। তিনি কাউকে কামনা করেন না, কারও ওপর তাঁর রাগ নেই। বীত-রাগ ভয় ক্রোধ। তিনি কান পেতে রইলেন। কী এক উদাস সুরে আনন্দ গান বাজে। রামপ্রসাদ তন্ময় হয়ে সেই গান লিখলেন।

'আমার অন্তরে আনন্দময়ী,
সদা করিতেছেন কেলি।
আমি যেভাবে সেভাবে থাকি নামটি কভু নাহি ভুলি।
আবার দুআঁখি মুদিলে দেখি, অন্তরেতে মুণ্ডমালী॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, মা বিরাজে শতদলে।
আমি শরণ নিলাম চরণতলে, অন্তে না ফেলিও ঠেলি॥'

* * *

সাধক রামপ্রসাদের চিন্তা: অন্তে যেন মায়ের চরণ প্রাপ্তি হয়। তিনি আসন থেকে উঠে ভাবের ঘোরে বাড়ি আসছেন।

স্বামীর হাঁটা দেখে সর্বাণীর বুক কাঁপে। ছেলেদের বল্লেন—

তোরা বাবাকে বাইরে যেতে দিস না। ওর পা টলে, পড়ে যেতে পারেন।

—ভয় নেই মা। বাবা আজকাল সিদ্ধাসনেই বসে থাকেন।

—তবু লক্ষ্য রাখিস।

রামতুলাল লক্ষ্য রাখে। যদি ও কাজকর্মে বেরিয়ে যায়, তাহলে রামমোহন। আর রামমোহন যদি ঘুড়ি ওড়াতে বা ডাংগুলি খেলতে যায়, তাহলে সর্বাণী। সাধ্বী রমণীর চিন্তাঃ স্বামী সাক্ষী পুত্র কোলে যেন মরণ হয় গঙ্গার জলে। সাধকের চিন্তা এক, সাধ্বীর চিন্তা আর।

পরণে লাল পাড় শান্তিপুরী শাড়ী, সিঁথিতে লাল সিঁতুর হাতে তুধশাদা শাঁখা। সর্বাণীকে মহিমাময়ী দেবীর ন্যায় দেখায়। সৌম্যা সৌম্যতরা আশেষ সৌম্যা।

[পাঁচ]

সতেরেশো পঁচিশ খৃষ্টাব্দ। হালিশহর উথাল পাতাল। ধর্মঘটের ঢেউ লেগেছে। সে কী ব্যাপার ?

মুর্শিদাবাদের মহারাজ নন্দকুমার তুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে বরাবর তাঁর আদি নিবাস রামপুরহাটের কাছে ভাতুরে ধুতি শাড়ী কেনেন। এবছর কী তাঁর খেয়াল কাপড় কিনলেন মুর্শিদাবাদের বাজারে। ভাতুরের তাঁতীরা নন্দকুমারকে ঘিরে ধরলেন—আমরা যে সারাবছর মাকু চালালাম তার কী হবে ?

নবাবী সেরেস্তার বড় কর্মচারী মহারাজ নন্দকুমার তাঁতীদের প্রশ্নের জবাব করলেন না। তিনি যেখানে খুশী কাপড় কিনবেন।

রাঢ় বাংলার তন্তুবায়শ্রেণী মহারাজের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করলেন। তাঁরা ঘট ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেন, কেউ মহারাজকে কাপড় বেচবেন না।

সেই ঘট ভাস্থর থেকে কাটোয়া, কাঞ্চনগর, সপ্তগ্রাম শান্তিপুর হয়ে হালিশহর এসেছে। তাঁতীরা শপথ নিলেন। ঘট গেল মুর্শিদাবাদ।

হালিশহরের ধনীরা শঙ্কিত হলেন। এসব কী? তাঁতী ধোবা নাপিত এক হয়ে নন্দকুমারের মাথা হেঁট করে দিয়েছে। মহারাজকে ওদের জগন্নাথের আটকে ভোগ খাইয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে।

জাগতিক ব্যাপারে নিরাসক্ত রামপ্রসাদ সব শুনলেন। তাঁর মনে কোন শঙ্কা নেই। 'বিষয় বুদ্ধি হইল হত। পাগল বলে সকল মত।' পাগলের ভয় কী? তাঁর বিরুদ্ধে খেটে খাওয়া মানুষ দাঁড়াবে না। তিনি একটি অন্যরকম গান গাইলেন। দেবীর রূপবর্ণনা নয়, নয় কাম আদি ষড়রিপু থেকে রক্ষা পাওয়ার আকুতি মৃত্যু ভয় ঘোচাবার প্রার্থনাও নয়। অন্য এক গান। গাইলেন—

"মন কেন তোর ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলি না॥
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি, জেনেও কি মন তাই জান না।
কোন লাজে তার মাটির মূর্তি গড়িয়ে করিস উপাসনা॥"—
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোনা।
ওরে কোন লাজে সাজাতে চাস তাঁয়, দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে কোন লাজে খাওয়াতে চাস তাঁয়,
আলোচাল আর বুট-ভিজানা॥
জগৎকে পালিছেন যে মা সাদরে, তাও কি জান না।
কেমনে দিতে চাস তুই বলি, মেষ মহিষ আর ছাগলছানা॥

সর্বাণী কেঁপে উঠলেন।

মা কালীর মূর্তি এতকাল মাটি দিয়ে গড়া হয়েছে, তাঁর মূর্তি এতকাল ডাকের গয়না দিয়ে সাজানো হয়েছে, মাকে এতকাল আলোচাল ভিজেছোলার নৈবেদ্য দেওয়া হয়েছে, মায়ের পুজোয়

এতকাল পাঁঠা মোষ বলি দেওয়া হয়েছে। ঠাকুর নিজেও এতকাল তাই করেছেন। আজ আবার একী কথা?

রামপ্রসাদ ধীর পায়ে গৃহাভ্যন্তরে এলেন। আচরণে কোন চঞ্চলতা নেই। যেমন মাদুর পেতে বিশ্রাম করেন তেমনি করছেন। স্থিরমতি।

সর্বাণী কোনদিন স্বামীকে তত্ত্ববিষয়ে প্রশ্ন করেন নি। স্বামী আলো স্ত্রী ছায়া। আজ ছায়া এমনই উদ্বিগ্ন যে প্রশ্ন করলেন—ওগো, একী গান লিখেছ?

—তোমার ভাল লাগে নি?

—আমি তোমার থেকে আলাদা নই।

—তবে?

—এ গান শুনলে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা রাগ করবেন। চিরাচরিত প্রথার প্রতিবাদ করো না।

রামপ্রসাদ মধুর হাসলেন। নয়নম্ মধুরম্, বদনম্ মধুরম্ হসিতম্ মধুরম্। বললেন—প্রতিবাদ নয়।

বলেই মধুর কণ্ঠে গান ধরলেন—'ত্যজিব সব ভেদাভেদ ঘুচে যাবে মনের খেদ, ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা।'

সর্বাণী মিথ্যাই ভয় পেয়েছিলেন। গান শুনে গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ রাগ করলেন না।

* * *

দুর্গাপুজোয় পরমেশ্বরী জগদীশ্বরী দু'মেয়েই এসেছে, সর্বাণীর মনে আনন্দ ধরে না।

বহুকাল পর হালিশহরে সেনবাড়ির দেয়ালে কলি ফেরানো হল, জানালা দরজায় দেওয়া হল তেলরঙ। বাসনকোসন যা তোলা থাকে বের করে মাজা হল, কাঁসা পিতল সব সোনার মতন ঝক ঝক করছে। পরমেশ্বরী সুন্দর আলপনা দিলেন মেঝেয়।

সর্বাণী রান্নাঘর নিয়ে ব্যস্ত। গুড় জ্বাল দেওয়া হয়েছে। নাড়ু বাঁধা হবে পাঁচরকম—নারকেল, তিল, ছোলা, খই আর ক্ষীর। সব

আলাদা আলাদা গামলায় সাজানো। ভিয়েনের সঙ্গে মেশানো হচ্ছে মেয়েদের ডাকলেন।

এদিকে তাঁতীবৌ এসেছে। জগদীশ্বরী নাড়ু বাঁধা ফেলে ছুটল। বালিকাবধূ আগে পছন্দ করবে। সর্বাণী ঠোঁট টিপে হাসলেন।

রামদুলাল ডাকল—মা।

—কী?

—এবার ধান যা হয়েছে। ঝাড়ে বিশ কাঠি।

সর্বাণী শস্যদেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন।

শস্য-সম্পদ-শক্তি রূপিণী দুর্গার বোধন। একটি কলাগাছের সঙ্গে কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, ডালিম, মানকচু অশোক আর ধান বেঁধে শস্যবধূ নির্মাণ করা হবে। এই শস্যবধূই দেবীর প্রতীক। নবপত্রিকা।

গ্রামে কোথাও জয়ন্তী পাওয়া যায়না তাই ব্রাহ্মণ রামপ্রসাদের বাড়িতে এসেছেন। তাঁর উদ্যানে বহুবিধ তরুলতা একথা সকলেরই জানা।

সর্বাণী জয়ন্তী সংগ্রহ করতে এলে রামপ্রসাদ বললেন—দেবী জয়রূপিণী তাই জয়ন্তীর সঙ্গে তাঁর যোগ। জয়ন্তীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী কার্তিকী।

*　　*　　*

ষষ্ঠীর সকালে দেবী প্রতিমার সম্মুখে রামপ্রসাদ কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ বসে রইলেন। তারপর ধীর লয়ে আগমনী গাইছেন—'আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার। এই যে নন্দিনী আইল বরণ করিয়া আন ঘরে। মুখশশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখ রাশি, ও চাঁদমুখের হাসি, সুধারাশিক্ষরে ॥'

সাধকনন্দিনী জগদীশ্বরী আবদার ধরলেন—আর একটা। রামপ্রসাদ গাইলেন—'ওগো রানি নগরে কোলাহল উঠ উঠ চল, নন্দিনী নিকটে তোমার গো ॥ চল, বরণ করিয়া গৃহে আনি গিয়া এসো না আমার সঙ্গে গো ॥'

কী গান। সমবেত জননীদের চোখ প্রবাসী তনয়ার জন্য জলে ভরে আসে। রামপ্রসাদ দেখলেন সর্বাণীরও চোখে জল। সাধকের বুঝতে কিছুই বাকী থাকে না। গাইলেন—'গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না। বলে বলবে লোকে মন্দ কারো কথা শুনব না॥ যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়, এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া, জামাই বলে মানবো না॥ দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়, শিব শ্মশানে মশানে ফিরে ঘরের কথা ভাবে না।'

এবার তনয়াদেরও চোখে জল এল। মা ও মেয়ে জড়াজড়ি করে কাঁদে।

রজনী। শয়নকক্ষের নিভৃতে সর্বাণী ধীরে স্বামীকে বললেন—বিয়ের পর কী আর মেয়েকে ধরে রাখা যায়? এবার বাড়িতে বউ আনো।

—সে তো তুমি আনবে।

—বাঃ! তোমার অনুমতি চাই না?

—দিলাম।

সর্বাণী গললগ্নীকৃতবাস স্বামীর পদধূলি নিলেন।

* * *

সপ্তমী অষ্টমী নবমী রব. দশমীতে বিদায় হব, দেহ আজ্ঞা পশুপতি। এই বলে উমা বাপের বাড়ি এসেছিল। সেই প্রথাই পুজোয় চলছে। আজ দশমী তিথি। দেবী কৈলাস ফিরে যাবেন। পূজামণ্ডপে জননী জায়া নন্দিনীর ভিড়। সধবা রমণী একে অপরকে সিঁদুর পরিয়ে দিচ্ছেন। সকল সীমন্তিনীর চোখ ছল ছল করে।

রামপ্রসাদ আবেগভরে গান ধরলেন—

"ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা দিবসে আঁধার॥
তনয়া পরের ধন বুঝিয়ে না বুঝে মন।
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার॥

সর্বাণী যতই শোনেন ততই তলিয়ে যান। এক গভীর গোপন সুখ তাঁর অন্তরে। কারণ যে কথা তিনি বলেছিলেন তাই কেমন ঠাকুরের ছোঁয়ায় গান হয়ে গেল।

তাই হয়। চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক দেখে রামপ্রসাদ গান করেন —ওরে মনচড়কী ভ্রমণ কর এ সংসারে। মহাযোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে না চিন তাহারে॥ বলরাম তর্কভূষণের বক্রোক্তি শুনে গান। —কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে, কেবল বাদার্থমাত্র, ঘটপটরে।

[ছয়]

সতেরশো একাশি খৃষ্টাব্দ। মহারাজ নন্দকুমার হেস্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ নেওয়ার অভিযোগ কাউন্সিলে পেশ করলেন। ফলে যা ঘটল তা সাংঘাতিক। হেস্টিংসের ইঙ্গিতে মোহনপ্রসাদ জালিয়াতির অভিযোগ আনলেন মহারাজের বিরুদ্ধে। হেস্টিংসের কিছুই হল না, নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ হল।

এমনি অধর্মের জয়ের যুগ। নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নাটোরের রাণী ভবাণী, বর্ধমানের মহারাজা তেজশ্চন্দ্র মহারাজ নবকৃষ্ণদেব সশঙ্কিত। কার কী হয় বলা যায় না।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রোগশয্যায় রামপ্রসাদের দর্শন প্রার্থনা করলেন। আর বেশী দিন নয়, মরণের পূর্বে যেন আর একবার তোমার শ্রীমুখ দেখতে পাই।

সংবাদ পেয়ে রামপ্রসাদ মহাবিপদে পড়লেন। তাঁর নিজের শরীর গতিকও ভাল নয়, মাথায় বড় যন্ত্রণা। তবু গেলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র শয্যাশায়ী। কাতর কণ্ঠে বললেন—কবিরঞ্জন, মিছে খেলায় দিন গেল।

এই কথায় সাধককবির মনে ভাব এল। তিনি গান ধরলেন—

"মা আমার খেলান হলো।
খেলা হলো গো আনন্দময়ী ॥
ভবে এলাম করতে খেলা, করিলাম খেলাধূলা,
এখন কাল পেয়ে পাষাণের বালা, কাল যে নিকটে এলো ॥
বাল্যকালে কত খেলা, মিছে খেলার দিন গোঁয়ালো।
পরে জায়ার সঙ্গে লীলা-খেলায় অজপা ফুরায়ে গেল ॥
প্রসাদ বলে বৃদ্ধকালে অশক্ত কি করি বল।
ওমা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়ে মুক্তি জলে টেনে ফেল ॥"

মহারাজ তদ্গত ভাবে শুনছেন। চোখের কোলে জল ভরে ওঠে।

* * *

কবির জীবন বুঝি তাঁর রচনায়। বৃদ্ধ এবং অশক্ত রামপ্রসাদ চিন্তামগ্ন। যা গানে এককাল লিখেছেন তাই নিয়েই তো তাঁর জীবন। সে গান যদি থাকে তিনিও থাকবেন।

অমাবস্যা। ঘোর অন্ধকার। সহসা আলো হয়ে গেল। সর্বাণী কুটির প্রাঙ্গণে, উদ্যানবেদীতে, পূজামণ্ডপে দীপ জ্বালালেন।

দীপান্বিতা রজনীতে। দেবী প্রতিমার সামনে ধ্যানস্থ রামপ্রসাদ ওষ্ঠে রহস্যের হাসি। তিনি গাইলেন—'যারে শমন যারে ফিরি। ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি ॥ শমনদমন শ্রীনাথচরণ, সর্বদাই হৃদে ধরি। আমার কিসের শঙ্কা মেরে ডঙ্কা, চলে যাব কৈলাসপুরী ॥'

প্রতিমা বিসর্জনের সময়ে রামপ্রসাদ পরিজন স্বজন বান্ধব সকলকে বললেন—আজ মায়ের বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই আমার বিসর্জন হবে। তোমরা সকলে প্রতিমা নিয়ে আমার সঙ্গে এস। আমি পদব্রজে চললাম।

পথিমধ্যে উল্লাসের গলায় গান ধরলেন—'কালী গুণ গেয়ে বগল বাজায়ে, এ তনু তরণি ত্বরা করি চল বেয়ে। ভবের ভাবনা কিবা মনকে কর নেয়ে ॥ দক্ষিণবাতাস মূল, পৃষ্ঠদেশে অনুকূল, আনায়াসে

পাবে কূল, কাল রবে চেয়ে॥ শিব নহে মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারি অনিমাদি। প্রসাদ বলে প্রতিবাদী, পলাইবে ধেয়ে॥'

গান শেষ হলে রামপ্রসাদের মনে উঁকি মারল সেই প্রশ্ন মৃত্যুর পর কী? তিনি হাসির গলায় গাইলেন—'বল দেখি ভাই কি হয় মলে? এই বাদানুবাদ করে সকলে। কেউ বলে ভূতপ্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি, কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মেলে॥ বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে। ওরে শূন্যেতে পাপপুণ্য গণ্যমান্য করে সব খেয়ালে॥ প্রসাদ বলে যা ছিল ভাই, তাই হবি রে নিদান কালে। যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, লয় হয়ে সে মিশায় জলে॥'

পথ ফুরোয়। সামনে ত্রিদশতরঙ্গিণী গঙ্গা। কালীপ্রতিমা বিসর্জন দিতে রামপ্রসাদ জলে নামলেন। অদ্য জননীর বিসর্জনের সঙ্গে তাঁর বিসর্জন হবে। তিনি জায়ার কথা চিন্তা করছেন না কিন্তু সর্বাণী তাঁরই কথা চিন্তা করছেন। পতি বিহনে কি ছার জীবন।

সাধক তীরে নীরে শরীর রেখে তৃতীয় গান গাইলেন—'নিতান্ত যাবে দীন, এদিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো। তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো॥ এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে। ওমা শ্রীসূর্য বসিল পাটে, লবে গো॥ দশের ভরা ভোরে লয়, দুঃখিজনে ফেলে যায়, ওমা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো॥ প্রসাদ বলে পাষান মেয়ে, আসান দে মা ফিরে চেয়ে আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো॥'

প্রতিমা ভাসান হয়ে গেল। গ্রামবাসীজন জল ছিটোয়। শান্তিবারি। সকলের শান্তি হোক।

রামপ্রসাদকে আজ বিসজনের গানে পেয়ে বাসছে। তিনি শেষগান ধরলেন—'তারা, তোমার আর কি মনে আছে। ওমা, এখন যেমন রাখলে সুখে, তেমনি সুখ কি পাছে। শিব যদি হন সত্যবাদী, তবে কি তোমায় সাধি, মাগো। ওমা, ফাঁকির উপরে ফাঁকি, ডান

চক্ষু নাচে ॥ আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমারে সাধিতাম নাই, মাগো। ওমা, দিয়ে আশা কাটলে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে ॥ প্রসাদ বলে মন পড়, দক্ষিণার জোর বড়, মাগো। ওমা, আমার দফা হল রফা, দক্ষিণা হয়েছে ॥'

দক্ষিণা হয়েছে, বলা মাত্র সাধক কবির প্রাণের দক্ষিণা হল। সমবেত জনতা তাঁকে তুলে শুইয়ে দিল জাহ্নবীতীরে। দেখা গেল নাসারন্ধ্রে ক্ষীণ রক্তধারা। প্রাচীনেরা অনুমান করেন, মরণকালে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হয়েছিল।

* * *

সাধকের সঙ্গে সাধ্বীও যায়। সর্বাণীর বড় আশা ছিল, আগে যাবেন। তা যখন হল না, সঙ্গেই গেলেন। এক চিতায়। পোড়ে নারী, ওড়ে ছাই, সতীরাণীর গুণ গাই।

বৈদ্যকুলপঞ্জীতে সতীরাণীর নাম লেখা হল না। শুধু লেখা হল—রামপ্রসাদ সেনঃ অভূৎ তত্ত্বজ্ঞঃ সাধকঃ সুধীঃ।

কমলাকান্ত

[এক]

সতেরোশো উনসত্তর খৃষ্টাব্দের এক সকাল।

রাঢ়বাংলার অম্বিকা-কালনা গাঁয়ে পূজারী ব্রাহ্মণ মহেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দেবী অম্বিকার নিত্যপূজো সেরে মন্দিরের বাইরে এলেন।

সেখানে পূজারীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন, অম্বিকার উগ্রক্ষত্রিয়, কৈবর্ত ও সদগোপ জাতের মশাইরা।

মহেশ্বর ভক্তদের প্রসারিত হাতের তালুতে তামার কুষি করে দেবীর চরণামৃত দিলেন। তারপর মায়ের নামে জয়ধ্বনি। ভক্তেরাও আওয়াজ দিল। মন্দির প্রাঙ্গণ মুখর হয়ে উঠল মা মা রবে।

মশাইরা বিদায় নিলে মহেশ্বর আকাশের দিকে তাকালেন। বেলা কত?

সূর্য মাথার ওপর আসতে সামান্য বাকী। বেলা এক প্রহরের মত হবে। মহেশ্বরের এখন মাঠে যাবার কথা। তা মনে হতে তিনি ভুরু কোঁচকালেন।

কাল রাতে মহেশ্বরের স্ত্রী মহামায়ার ছেলে হয়েছে। প্রসূতির শরীরের অবস্থা ভাল নয়। প্রসব হতে খুব কষ্ট হয়েছে। শিশুটি সাধারণের থেকে বড়।

*　　　*　　　*

সাত বছর পর।

মহেশ্বরের সেই শিশু এখন টোলে যায়। নাম কমলাকান্ত। একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুল। চোখ দুটি আয়ত। গায়ের রং ফর্সা।

গ্রীষ্মকাল। কমলাকান্ত আর ক'জন পড়ুয়া গায়ে পিরাণ না দিয়ে টোলে এসেছে। তাদের গরম সহ্য হয় না পড়ার সময়।

টোলের পণ্ডিতমশাই কিছুটা যেন অন্যমনস্ক। তিনি পড়ুয়াদের দিকে এক পলক মাত্র তাকালেন। তারপর আপনমনে গুণ গুণ করেন—শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা শ্বেতগন্ধানুলেপনা……

কমলাকান্তের গানে বড় কৌতূহল। মুখ তুলে গুরুমশাইকে প্রশ্ন করল—এ গান কার ?

—গান নয়। গুরুমশাই বুঝিয়ে বলেন—এ হল পদ্মপুরাণের সরস্বতীস্তোত্র।

—পদ্মপুরাণ। কমলাকান্ত আবদার ধরল—আমি পুরাণ শুনব।

* * *

বৃষ্টি নেই। অম্বিকা গাঁয়ের মাঠে সেচপুকুর থেকে ছুনি করে জল দেওয়া হচ্ছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে চারটে ছুনি। একটায় কৃষাণের সঙ্গে কৃষাণীও রয়েছে। তাদের ঘামে ভেজা কালো শরীর চকচক করে।

বালক কমলাকান্ত বিভোর হয়ে জলসেচ দেখছে। সময়ের খেয়াল নেই। আহারের সময় পার হয়ে যায়।

মহেশ্বর ভাবুক ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। খিড়কির ঘাটে পা ধুতে এসেছেন। মহামায়া কাপড় দিলেন মাথায়।

কমলাকান্তর সবকিছুতে নজর। বাবাকে জিজ্ঞেস করে—তোমাকে দেখলে মা লজ্জা পায় কেন ?

মহেশ্বর কী আর উত্তর দেবেন, মৃদু হেসে ছেলেকে বললেন—লজ্জা নারীর ভূষণ।

কমলাকান্তের প্রত্যয় গেল না। মা কালীও তো নারী। তার তো লজ্জা নেই।

* * *

পুঁথির ওপর চোখ রেখে কমলাকান্ত ভাবছে। পাঁচ বছর ব্যাকরণের কচকচি অনেক শেখা হল। আর ভাল লাগে না। এবার পুরাণের

গান শিখবে। গুরুমশাই যদি না শেখান তো আর টোলে আসবে না। বাড়িতে বসে নিজেই শিখবে।

আজ টোলে না গিয়ে কমলাকান্ত আগমবাগীশ পাড়ায় ঢুকল। একটি ছাতার মতন আমগাছ ওর খুব পছন্দ। তার তলায় জুত করে বসে গাইছে—'আর কিছুই নাই শ্যামা, মা তোর কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা…।'

ফুটফুটে বালকের রিণরিণে কণ্ঠস্বর। যারা কমলাকান্তর গান শুনছে, তারা দর্শনে শ্রবণে মুগ্ধ। এক ব্রাহ্মণী হেসে বললেন—কমলা হলেই তোকে মানাতো বেশী। বেশ তো গাস। গা আর একটা।

কমলাকান্ত অনেকগুলো গান গেয়ে শোনাল। কোনটা রামপ্রসাদের কোনটা চণ্ডীদাসের আবার কোনটা ওর নিজের।

* * *

বাঁড়ুজ্জেবাড়িতে এক বিপর্যয়। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত বলা চলে। মহেশ্বর হঠাৎ অসুস্থ বোধ করছেন। বুকের বাঁদিকে ব্যথা। এমন কিছু নয় কিন্তু তিন দিনের দিন মারা গেলেন। যার আসার কোন ঠিক নেই তার নাম মরণ।

কিশোর কমলাকান্ত দিশেহারা। মা রয়েছে ছোটভাই শ্যামাকান্ত রয়েছে। এদের দেখাশোনা ওকে করতে হবে? প্রতিবেশীর বচন কেবলই মনে পড়ে। 'জনম লয়েছ আগে, সব ভার তোমার লাগে।'

শ্মশানে পিতার মুখাগ্নি করে কমলাকান্ত বিহ্বল দাঁড়িয়ে রয়েছে। নশ্বর শরীর আর কিছুক্ষণ পর ছাই হয়ে যাবে। তখন আর মহেশ্বরের কিছুই থাকবে না। প্রতিবেশীরা তাড়া দিল—কমলাকান্ত চলে যা। মুখাগ্নি করার পর আর দাঁড়াতে নেই।

কমলাকান্ত ধীর পায়ে গেল গঙ্গাপাড়ে। জলে পা ডুবিয়ে বসল। আপন মনে গায়—'কেহ সংসারে এসেছে, বড় সুখে আছে, পেয়েছে রাজ্যভার। আমার দরিদ্রের ধন, দুখানি চরণ, হৃদয়ে করেছি হার।'

কমলাকান্তর মামাবাড়ি চান্না। সেখানে মহেশ্বরের মৃত্যু সংবাদ গেল। নারায়ণ ভট্টাচার্য্য ত্বরায় বোনের কাছে এলেন। ক্রিয়াকর্মের ভার পড়ল তাঁর ওপর।

যথাবিহিত শ্রাদ্ধ শান্তি হল। নারায়ণ বোন ও ভাগনেদের চান্না নিয়ে যেতে চাইলেন। মহামায়া রাজী হলেন না। তার ইচ্ছে, কমলাকান্তর পৈতে হোক, তারপর যাবেন চান্না। সুতরাং নারায়ণ একাই চান্না ফিরলেন।

অশৌচ কাল গত হলে নারায়ণ আবার অম্বিকায় এলেন: কমলাকান্তর উপনয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

দরিদ্রের সংসার। পৈতে উপলক্ষে তেমন দীয়তাং ভুজ্যতাং হল না। পূজা, হোম, মুণ্ডণ, ভিক্ষা ও গায়ত্রীদীক্ষা। এসব কিন্তু হল যথাবিহিত। দীক্ষার পর কমলাকান্ত অস্বাভাবিক গম্ভীর গলায় বল্লেন —আমি সন্ন্যাসী হব।

কী সর্বনেশে কথা! মহামায়ার বুকে কাঁপন ধরে যায়। তিনি অনেক করে ছেলেকে নিবৃত্ত করলেন। তারপর দাদার সঙ্গে পরামর্শ করেন। কমলাকান্তকে নিয়ে কী করা যায়?

*　　　　*　　　　*

চান্না থেকে প্রায় ছ ক্রোশ দূরে লাকুড্ডি। এখানে নারায়ণ এসেছেন কমলাকান্তর জন্যে কনে দেখতে। যে যুবা সন্ন্যাসী হতে চায় তাকে গৃহী করতে হলে একমাত্র উপায় বধূ।

যে মেয়েটিকে নারায়ণ দেখলেন তার বংশ ভাল স্বভাব নম্র এবং তার রূপলাবণ্য আছে। সুতরাং পছন্দ হয়েছে তাঁর। তিনি সম্বন্ধ নিয়ে অম্বিকা গেলেন। মহামায়ার মতামত চাইলে তিনি নীরব। তাঁর আবার মতামত কী? ভাইয়ের পছন্দই বোনের পছন্দ।

মহামায়া ডাকলেন—কমলাকান্ত।

—কী?

—তোর বিয়ে ঠিক করেছি।

—কিন্তু মা—। কমলাকান্ত আপত্তি জানায়।

—কোন কিন্তু নয় বাবা। আমার কথা রাখ। মহামায়া চোখে জল এনে ফেললেন।

একুশ বছরের যুবা কমলাকান্ত সাহসী হলেও মায়ের চোখের জলকে খুব ভয় করেন। তিনি আর আপত্তি করলেন না। মায়ের যা ইচ্ছে তাই হোক।

শুভদিনে লাকুড্ডির ভট্টাচার্য গৃহে শাঁখ বাজল উলুধ্বনি হল। কমলাকান্ত একটি কিশোরীর হাত ধরে বললেন—যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম।

কমলাকান্ত কেমন যেন উদাসীন। জননী আছেন, জায়া আছে। তবু মাঝে মাঝে বড় একা লাগে। মনে হয়, সংসার বড় ফাঁকা।

আজ মহামায়া ছেলেকে বোঝাচ্ছেন—বামুনের ছেলে। লেখাপড়া শিখেছ, বিয়ে থা করেছ। এবার সংসারী হও। পৈত্রিক বৃত্তিতে মন দাও রোজগার করো।

কমলাকান্ত নীরব। মায়ের সঙ্গে তর্ক করতে মন চায় না। আর করলেও মা বুঝবে তার কথা?

দুপুরবেলা। এখন ঘরের বাইরে খুব রোদ। কমলাকান্ত শোবার ঘরে বসে পুঁথি খুললেন। ভাল লাগল না। পুঁথি বন্ধ করে গাইছেন—'মজিল মনভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে। যত বিষয় মধু তুচ্ছ হৈল, কামাদি কুসুম সকলে॥ চরণ কালো ভ্রমর কালো, কালো কালোয় মিশে গেল…'

খেতে দিলে কমলকান্ত নিমিত্তমাত্র খেলেন। ভাত পাতে পড়েই রইল। তাঁর মনে বড় অস্থিরতা। এই সুখ এই দুঃখ। দুটোকে সমান ভাবে নেওয়া যায় না? তিনি রোদ মাথায় করেই বাড়ি থেকে বেরোলেন।

বধূ বুঝলেন স্বামীর কিছু হয়েছে কিন্তু সেটা কী তা তাঁর ধারণার বাইরে। খুব কাছের মানুষও হয়েও তিনি সাধকের মনের নাগাল পাচ্ছেন না।

রাত্রে কমলাকান্তর ঘুম আসে না। শুয়ে শুয়ে ভাবছেন। সুখ দুঃখ সমান করতে পারলে তবেই আনন্দ। কী করে করা যায়? বধূ এল পাশে শুল। তিনি একটিও কথা বললেন না। ভাবছেন। সুখ দুঃখ সমান করতে হলে সাধনা চাই।

কমলাকান্ত গুরুর সন্ধানে বেরোলেন।

* * *

বৈশাখী পূর্ণিমা।

আউস গ্রামের গোবিন্দ মঠে আজ গোপালের ফুলদোল। সকালে বৈষ্ণবগণ ফুল তুলতে গেলেন। উদ্যানে চম্পক, মল্লিকা, শিরীষ, যূথিকা, মালতী আর মাধবী অনেক ফুটেছে। বৈষ্ণবদের হাতের সাজি ভরে গেল। তাঁরা মঠে ফিরলেন।

সারাদিন বৈষ্ণবীগণ মালা গেঁথে রাধাকৃষ্ণের মঞ্চ সাজালেন, প্রাঙ্গণ ঝাঁটপাট দিলেন, স্থানে স্থানে আলপনা দিলেন। মঠ সুন্দর হল।

সন্ধ্যায় নির্মল আকাশে চাঁদ উঠল। আলোয় মঠ আলো। মৃদু-মন্দ বাতাস বইলে ফুলের গন্ধে মঠ ভরে গেল। বৈষ্ণব বৈষ্ণবী কীর্তনের পদ ধরলেন।

এমন সময় কমলাকান্ত এলেন মঠে। কী এক প্রসন্নতায় তাঁর মনে ভরে গেল।

* * *

মঠের অধিকারী চন্দ্রশেখর গোস্বামী* স্মিত হেসে জিজ্ঞাসু কমলা-

অতঃপর কহি শুন আত্মনিবেদন
ব্রহ্মকুলে উপনীত স্বামী নারায়ণ॥
জন্মভূমি অম্বিকা নিবাস বর্ধমান।
শ্রীপাট গোবিন্দমঠ গোপালের স্থান॥
প্রভু চন্দ্রশেখর গোস্বামী মহাধন।
তাঁর পদরেণু যার মস্তক ভূষণ॥

কান্তকে বলছেন—ঈশ্বর রসস্বরূপ। রস কী? শ্রীপাদ আচার্যের মতে, উৎকট ইচ্ছার বাচকই রস। উৎকট ইচ্ছা কী? মনের এক মাত্র ইচ্ছাই উৎকট ইচ্ছা। যখন মানুষ অর্থ, মান, নারী বা এমন পার্থিব কিছু পেতে ইচ্ছা করে, তখন তা একমাত্র ইচ্ছা হতে পারে না। একটা পেতে চাইলে আর একটা পাওয়ার ইচ্ছা এসেই যায়। তাঁকে পাওয়ার ইচ্ছাই হল—একমাত্র ইচ্ছা। সে ইচ্ছা এমনি আসে না।

—কী করে আসে?

—বলছি শোনো। ইচ্ছা মনের অনুকূল। মন যদি অন্তর্মুখী হয় তাহলে একটা সময় আসে যখন তাঁকে পেতে ইচ্ছা আসে। কিন্তু সকলের কাছে এক ভাবে নয়। মন যদি শক্ত হয় তাহলে শ্যামাকে আর মন যদি নরম হয় তাহলে শ্যামকে, অবলম্বন করে ভাব আসে। ভাবের সাধনায় মন অন্তর্মুখী হয়। তুমি কাকে অবলম্বন করতে চাও? শ্যামকে না শ্যামাকে?

কমলাকান্ত দীর্ঘকাল চুপ করে রইলেন। তারপর মাথা নাড়েন—জানি না।

গোস্বামী নরম গলায় বললেন—কিছুদিন আমাদের সঙ্গে থাকো। মতিস্থির হলে জানিও আমাকে।

* * *

প্রভাতকাল। গোবিন্দমঠে পূজার আয়োজন চলছে। মঞ্চ থেকে কিছুদূরে ধূলায় বসে কমলাকান্ত গাইছেন—'হে শ্যাম। পরমপুরুষগুণ-ধাম। মম হৃদি সরোজ নিবাস বঁধু, পূরয় মনোভিরাম॥ গুণাকর গুণনিধি, সগুণবিধি, অতি অনুপম তুয়া নাম। কমলাকান্ত জীবন ধনপ্রাণ তব গুণে রত বসু যাম॥'

পূজা শেষ হলে কমলাকান্ত ঠাকুরের প্রসাদ পেলেন। কিছু ফলমূল আর বাতাসা। তাই খেয়ে তিনি নামজপ করছেন—কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব।

অপরাহ্ণ বেলায় কমলাকান্ত আর একবার স্নান করলেন। শরীরে বড় জ্বালা। ভিজে কাপড় গায়েই শুকলো। তিনি ঠাকুরের কাছে গেলেন।

* * *

গোপালকে ঘিরে আশ্রমবাসীদের জীবন। তাঁর পূজা তাঁর ভোগ তাঁর আরতি এই নিয়েই সময় কাটে। কারও খারাপ লাগে না। আজ হঠাৎ কমলাকান্তরও ভাল লাগল। তিনি সান্ধ্য আসরে গাইবার জন্য একটি গীত রচনা করতে বসলেন। কানুকে নিয়ে গীত।

এভাবেই দিন যায়।

* * *

আষাঢ়ের মেঘ মেদুর সকাল। প্রভু চন্দ্রশেখর কৃষ্ণে সমর্পিত প্রাণ কমলাকান্তকে দীক্ষা দিচ্ছেন। তাঁর উপদেশ হল—নাম ভজরে নাম চিন্তরে নাম কররে সার।

কমলাকান্ত নাম, জপও করেন গেয়েও শোনান। এখন শ্রীখোল বাজিয়ে গাইছেন—'জয় জয় মাধব মুকুন্দ মুরারি। জয় বৃন্দাবনচন্দ্র জয় নন্দসুত, জয় বৃকভানু কুমারী॥ পীতাম্বর ধর, বনমালা ধর, রাধা-ধর বনোয়ারী। ব্রজবণিতামুখ, দাবক নায়ক জয় পীতম জয় প্যারী। জয় গোবিন্দগোপাল, জনার্দ্দন জয় গোবর্দ্ধনধারী॥'

বৈষ্ণব বৈষ্ণবীগণ গান শেষ হলে ভক্তির চোখে কমলাকান্তকে নিরীক্ষণ করেন। এ তো সামান্য ভক্ত নয়। গাইবার সময় কেমন যেন ঘোরের মধ্যে থাকেন। এই তো মহাভাবের লক্ষণ।

বর্ষা শেষ হলে চন্দ্রশেখর গোস্বামী সস্নেহে কমলাকান্তকে বললেন—প্রভুপাদ, অনেকদিন হল বাড়ি যাও নাই। প্রকৃতি ছাড়া রয়েছে। বাড়ি যাও এবার। আশীর্বাদ করি, তাঁর কৃপা পাও।

গোস্বামীর পদরেণু মাথায় নিয়ে কমলাকান্ত স্বগৃহে যাত্রা করলেন। জায়া ও জননী সন্নিধানে।

অম্বিকায় যেমন শাক্ত আছেন তেমনি বৈষ্ণবও আছেন। গ্রামে কালীমন্দিরও আছে রাধাকৃষ্ণের মঠও আছে। তবে মঠের থেকে মন্দিরের রমরমাই বেশী।

কমলাকান্ত নিয়মিত মঠে যান। তাঁর সঙ্গীতে সহজাত অধিকার। কখনও পদাবলী কীর্তন কখনও রাগপ্রধান গান পরিবেশন করেন। সেসব মহাজনদের রচনা আবার তাঁরও।

* * *

মহাপ্রভুর আবির্ভাব দিনে মঠে গ্রামান্তর থেকে কীর্তনিয়া এলেন। বেশ কয়েক দল। আহোরাত্রি নামগান হচ্ছে। সন্ধ্যায় একজন খ্যাতিমান্ কীর্তনিয়া রাগসঙ্গীত গাইছেন। রাগ মূলতান।

কমলাকান্ত শুনছেন! কান খরগোষের মত খাড়া, যেন একটিও সুর না হারায়।

কয়জন কীর্তনিয়া গাইলেন। গ্রামের প্রধান কমলাকান্তকে গাইতে অনুরোধ করলেন। কমলাকান্ত নীরব। কী গান গাইবেন? সহসা চোখেরমণি নড়ল। তিনি খ্যাতিমান গায়কের রাগ মূলতানের গান গাইলেন—'আমার গৌর নাচেরে, যাচে হরিনাম সংকীর্তন রসপ্রকাশে। হরিহরি বলি দেয় করতালি, কলি কলুষ নাশে।'

আসরে হরি ধ্বনি উঠল।

আস্থাইয়ের পর কমলাকান্ত অন্তরা ধরলেন—'তড়িতপুঞ্জ জড়িত কায়, শরত ইন্দু বদন তায়। একি আনন্দ ভকতবৃন্দ, মগন প্রেমপাশে॥ ক্ষণে অচেতন অবশ অঙ্গ, ক্ষণে পুলকিত ভকত সঙ্গ। রাধা পুনরাধ্য ভাবপ্রসঙ্গ, প্রকট সুখবিলাসে॥'

ভক্তগণ এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করেন। এ কোন পদকর্তার রচনা? যখন জানা গেল পদকর্তা কমলাকান্ত তখন তাঁরা গর্ব বোধ করেন। তবে সকলে নয়। কয়েকজন বৈষ্ণব হয়েও কমলাকান্তকে ঈর্ষা করেন।

কমলাকান্ত'র কিছু স্তুতিলাভ হল, কিছু নিন্দাও। হায়! এ জগতে কিছুই অবিমিশ্র নয়।

*　　　　*　　　　*

বাড়িতে কমলাকান্ত চুপচাপ রয়েছেন। মঠে যেতে ইচ্ছা করে না। অলস চোখে মায়ের গেরস্থালি দ্যাখেন।

সামনে দুর্গোৎসব। দু তিন রকমের নাড়ু হচ্ছে। আজ বিকেল-বেলা কমলাকান্তর কী খেয়াল, ডাকল—মা।

—মহামায়া সাড়া দিলেন—কী!

—কমলাকান্ত হাসলেন—কিছু না।

—তবে ডাকলি কেন?

—মা বলে ডাকলে কেমন লাগে দেখছিলাম। অনেকদিন ডাকিনি তো। কমলাকান্ত আবার হাসলেন।

*　　　　*　　　　*

আমবাগানে তরল অন্ধকার। তবু কমলাকান্ত ঢুকলেন। কিছু-ক্ষণ পর পদচারণা করছেন আর ভিন্ন ভিন্ন সুরে একই পদ গাইছেন—মন, মা বলে ডাকো রে। গাইতে গাইতে গলা চিরে যায়। তবু গাইছেন।

সহসা তাঁর এক উপলব্ধি হল। মা ডাকে যখন এতই মধু তখন তাঁকে মা বলেই ডাকা উচিত। অন্য নামে নয়। এই উপলব্ধি তাঁকে অস্থির করে।

*　　　　*　　　　*

গুন্ধড়ে গাঁয়ে রক্ষাকালীর পুজো হচ্ছে। খবর পেয়ে কমলাকান্ত মামাবাড়ি এসেছেন। এ পথেই গুন্ধড়ে যেতে হবে। রাত্রে মামী খেতে দিয়ে বললেন—কমলা, তোর কণ্ঠি কী হল?

—ফেলে দিয়েছি। কমলাকান্ত মুখ নামান।

আজ কমলাকান্ত অনেক হেঁটেছেন। খুবই ক্লান্ত তবু ঘুম আসে

না। তাঁর মনের প্রশান্তি নষ্ট হয়েছে। হরিনাম নয়, মন যেন অন্য কিছু চায়।

সকাল হতেই কমলাকান্ত গুপ্ধড়ে যাত্রা করলেন। এখান থেকে পাঁচ ক্রোশ।

* * *

রক্ষাকালী তলায় কমলাকান্তর পরিচয় হল কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। মহাশয় তন্ত্রসাধক এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিশারদ। সম্পন্ন গৃহস্থও বটেন। প্রায় শ বিঘে ধানজমি।

কমলাকান্ত ও কেনারামের আলাপ জমতে বেশী দেরী হল না। তাঁরা সঙ্গীত বিষয়ে কথা বলেন অবিরল। দুজন মানুষ সমপ্রকৃতির হলে যা হয়। এক সময় কেনারাম বললেন—আমার থেকে অনেক ছোট। তুমি বলছি।

—বলুন।

—ঘর দিয়ে চল। সেখানেই থাকবে কদিন। গান বাজনা হবে।

—ঘর কোথায় আপনার?

আমরাগড়। মানকরের কাছে। অতি প্রাচীন স্থান। রাজা মহেন্দ্র'র গড় ছিল। রাণীর নামে গড়।

—ঠিক আছে। যাব, তবে আজ নয়।

মেলা দেখে কমলাকান্ত নিজের ঘরে ফিরলেন।

* * *

অম্বিকায় এবছর শীত খুব বেশী। উত্তুরে শীতল বাতাসে ক্ষুরের ধার। গায়ে লাগলে হাড় মাংস কুরকুর কাটে।

কমলাকান্ত উদোম গায়েই রয়েছেন। মাঝে মাঝে ধুতির খুঁট জড়িয়ে নিচ্ছেন গায়ে। বড়ই চিন্তিত। তন্ত্র কী সাধনার ঠিক পথ? তান্ত্রিক কী জানে, দেহের কোথায় কোন শক্তি খেলা করছে আর কীভাবে সেসব শক্তি কাজে লাগানো যায়? কেনারামের কথা কী ঠিক?

ঘরের নিয়ম হল : আছে মানুষ আছে কাজ। কমলাকান্ত আছেন তাই তাঁর কাজও আছে। রবিশস্যের চাষ বাড়ানো হল। মহামায়া কমলাকান্তকে মাঠে পাঠান। কখনও কখনও বধূ। আজ কথা না শোনায় বধূ অভিমান করেছেন।

তত্ত্ব চিন্তা করলেও কমলাকান্ত প্রকৃতির অধীন। বধূর মান ভাঙ্গাতে তিনি গান ধরলেন—'কি লাগিয়ে প্রাণপ্রিয়ে মানিনী হয়েছ। ও বিধুবদনি কেন মুখ মলিন করেছ।'

বিধুবদনী মান পরিহার করলেন। তিনি অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করেছেন স্বামীর বাড়ি ফেরার, মুখের একটি কথা শোনার। সেই স্বামী আজ প্রসন্ন হয়েছেন আর তিনি মুখ ফিরিয়ে থাকবেন ?

* * *

সুখনিশি ভোর হলে কমলাকান্ত বসলেন পুঁথি নিয়ে। কতিপয় ছাত্র পাঠ নিতে এল। তিনি তাদের নিয়ে একপ্রহর কাটালেন। অধ্যাপনা খারাপ লাগল না।

দুপুরে স্নানের পর কমলাকান্ত জপে বসলেন।

জপাৎ সিদ্ধিঃ। এ তন্ত্রের কথা। এর থেকেই বৈষ্ণবীয় নাম-কীর্তন। তবে শাক্ততন্ত্র আর বৈষ্ণবশাস্ত্র অভেদ নয়। তন্ত্রের মূল কথা : অহং দেবী ন চ অন্যঃ অস্মি যুক্তঃ অহম্ ইতি ভাবয়েৎ। আমিই আমার ইষ্ট দেবী আমা ছাড়া অন্য দেবতা নাই, এইরূপ ভাববে। তন্ত্রের এ কথা থেকে বৈষ্ণবরা কিছুই গ্রহণ করেন নি। তাঁদের মতে কৃষ্ণই সব, আমি কেউ নই।

কমলাকান্ত বৈষ্ণবশাস্ত্রে দীক্ষিত আবার শাক্ততন্ত্রের প্রতি অনুরক্ত। তাই জপ করতে বসে অস্থির। কোনটা তাঁর পথ ? বৈষ্ণব শাস্ত্র না শাক্ততন্ত্র ? আত্মনিবেদন না আত্মউদ্বোধন ? মধুরভাব না বীরভাব ?

সংশয় ঘোচাতে কমলাকান্ত অমরাগড় যাওয়া ঠিক করলেন। এবং তা জানালেন জায়া ও জননীকে।

বধূর বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। বৃদ্ধা মাতাও চুপ করে রইলেন। যার সংসারে মন বসল না, তাকে তিনি কী করে ধরে রাখবেন ?

কমলাকান্ত ছাত্রদের কাছে সংকল্প প্রকাশ করলে এক ধনী ছাত্র আশ্বাস দিল, অধ্যাপকের সংসারের সব ভার তার। সে গুরুমাতা ও গুরুপত্নীর দেখাশোনা করবে। চাষবাসের ব্যাপারে শ্যামাকান্তকে সাহায্যও করবে।

নিশ্চিন্তমনে কমলাকান্ত বাড়ি ছাড়লেন।

* * *

চান্নায় কমলাকান্তর মামাবাড়ি। তিনি এখানে অনেকবার এসেছেন। আবার এলেন। মামাবাড়ির চেয়েও বড় আকর্ষণ বিশালাক্ষী মন্দিরের।

চান্নার উত্তরে আঁকাবাঁকা খড়েগশ্বরী নদী। গাঁয়ের লোকেরা বলে খড়ি। তার পাড়ে আমবাগান। গাঁ থেকে দূরে অতি নির্জন স্থান। রাত্রে সেখানে কেউ যায় না। আমবাগানের মাঝখানে একটি অনুচ্চ চতুষ্কোণ পাকাবাড়ি। ছাত সমতল, চূড়া নেই। এটাই বিশালাক্ষী মন্দির।

সকালবেলা। কমলাকান্ত মন্দিরের রোয়াকে উঠে দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছেন। অধর ও ওষ্ঠ ঈষৎ নড়ছে—'ধ্যায়েৎ দেবীং বিশালাক্ষীং তপ্ত জাম্বুনদ প্রভাং। দ্বিভুজাং অম্বিকাং চণ্ডীং খড়গ খর্পরধারিণীং॥ নানালঙ্কার সুভগাং রক্তাম্বরধরাং শুভাং। সদা ষোড়শ বর্ষীয়াং প্রসন্নাস্যাং ত্রিলোচনাং॥ মুণ্ডমালাবতীং রম্যাং পীনোন্নত পয়োধরাং। শিরোপরি মহাদেবীং জটা মুকুট মণ্ডিতাং।'

কে যেন জয়ধ্বনি করল। বেশ গম্ভীর স্বর। কমলাকান্ত ইতি উতি তাকালেন। কাউকে দেখতে পেলেন না। তিনি স্নান করতে গেলেন।

নদীর ঘাটে কমলাকান্ত এক রক্তবস্ত্র পরিধান তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর* দেখা পেলেন। তিনি বিস্মিত। এখান থেকে তান্ত্রিক জয়ধ্বনি দিয়েছিলেন কিন্তু মনে হয়েছিল খুব কাছ থেকে। কী উচ্চারণ!

তান্ত্রিক ব্যায়াম সেরে বিশ্রাম করছেন, কমলাকান্ত প্রণাম করলেন। তিনি বললেন—কী চাও?

কমলাকান্ত উত্তর খুঁজে পান না। তান্ত্রিক দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করতে ঘুমভাঙা গলায় বললেন—তাঁকে চাই।

—তিনি হৃদ্‌বিহারী। তোমাতেই আছেন। ডাকো।

—কী বলে?

তান্ত্রিক নীরব। একটু ভেবে বললেন—আমি তাঁকে মা বলে ডাকি। ব্রহ্মে স্ত্রীরূপের আরোপ করেছি। তন্ত্র বলে, সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্ম স্ত্রী-পুং রূপং ধত্তে।

কমলাকান্তর মনে শ্রদ্ধার উদয় হল। তিনি প্রার্থনা করেন—আপনি আমার গুরু হউন।

—না। তান্ত্রিক মাথা নাড়লেন—তোমার গুরু সিদ্ধিকৌল।

—তিনি কোথায়?

—সময়ে জানতে পারবে। তান্ত্রিক গাত্রোত্থান করলেন।

*　　　*　　　*

কাকভোরে কমলাকান্ত বেরোলেন মামাবাড়ি থেকে। চলেছেন অমরাগড়। সাতক্রোশ হাঁটলে ওড়ডাঙ্গা। ভয়ংকর স্থান। ডাকাত ঠ্যাঙ্গারের লীলাভূমি। তাদের হাতে পড়লে নিস্তার নেই। সুতরাং বেলাবেলি ডাঙ্গা পৌঁছতে হবে এবং সন্ধ্যার আগেই হতে হবে পার।

কমলাকান্ত খড়িনদীতে নামলেন। জল কোথাও একহাঁটু কোথাও একটু বেশী। তাঁর ধুতি ভিজল না।

নদীর এপাড়ে ঘোষদের বাস। গরুর পাল গাঁ থেকে বেরোচ্ছে। বাগাল ছেলেটা দূর থেকে কমলাকান্তকে প্রণাম করল। অন্ত্যজশ্রেণীর বালক পায়ে হাত দিতে সাহস পায় না।

---

* হরানন্দ সরস্বতীর মতে ইনি কমলাকান্তর দীক্ষা গুরু নন।

সামনে আবার একটা গাঁ। মন্দিরের চূড়া দেখা যায়। কমলাকান্ত দূর থেকে বাগাল ছেলেটার মত প্রণাম করলেন। গাঁয়ে ঢুকলে বসতে হবে। তিনি দেরী করতে সাহস পান না।

দুই প্রহর বেলায় কমলাকান্ত ওড়ডাঙ্গায় পা দিলেন। ধূসর শক্তমাটির প্রান্তর। দিগন্ত বিস্তারী। তিনি হাঁটতে হাঁটতে লক্ষ্য করলেন, ঝোপ ঝাড় বাড়ছে। বনকুলের ঝোপ আকন্দের ঝাড় আর পলাশের জটলা।

রোদের বড় তেজ। কমলাকান্ত একটি ঝাঁকড়া গাছের তলায় পা মুড়ে বসলেন। সঙ্গে আহার্য রয়েছে কিন্তু জল নেই। সুতরাং অভুক্ত থেকেই বিশ্রাম করছেন।

মৃদুমন্দ বাতাস বয়। তাঁর ক্লান্ত চোখ বুঁজে আসে। যখন তন্দ্রা ভাঙ্গল তখন অপরাহ্নবেলা। ছায়া ছায়া চারদিকে। কমলাকান্ত দ্রুতপায়ে হাঁটা দিলেন।

পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত গেল। পাখিরা ফিরে আসছে কুলায়ে। কমলাকান্ত হাঁটছেন। চারক্রোশ ডাঙ্গা ফুরোতে আর চায় না। সহসা ভয়ঙ্কর আওয়াজ উঠল—হা রে রে রে।

কমলাকান্ত ভয় পেলেন। ডাকাত সর্দারের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারলেন না। অধোবদনে বললেন—আমার সঙ্গে আছে ছাতা লাঠি আর এই গামছায় বাঁধা চিঁড়ে গুড়।

—চিঁড়ে গুড়। সর্দার হেঁকোড় দিল—সোনাদানা বের কর।

—সোনাদানা কিছুই নাই।

—তবে মর। সর্দার লাঠি তুলল।

কমলাকান্ত ইষ্ট নাম জপ করেন। সর্দার জপ শেষ করার অপেক্ষায় লাঠি নামাল। ডাকাতেরও বিবেচনা আছে। জপের সময় হত্যা করলে বেশী পাপ।

জপ শেষ হতেই কমলাকান্ত গান ধরলেন—'আর কিছুই নাই

শ্যামা, মা তোর কেবল দুটি চরণরাঙ্গা! শুনি তাও নিয়েছে ত্রিপুরারি, দেখে হলাম সাহসভাঙ্গা।

ডাকাতসর্দার মন দিয়ে গান শুনছে। কমলাকান্ত সাহস পেলেন। যে ঘোর পরিস্থিতিতে তিনি রয়েছেন, তার মোকাবিলা করতে একটি গান রচনা করলেন। এবং তা গাইছেন—'জ্ঞাতিবন্ধু সুতদারা, সুখের সময় সবাই তারা। বিপদকালে কেউ নাই, ওড়ডাঙায় গেলাম মারা।'

কমলাকান্ত'র গানে এমন কিছু রয়েছে যা সর্দারকে হিংসা ভুলিয়েছে। সে নরমচোখে তাকাল—গাও ঠাকুর, অন্য একটা গান গাও।

কমলাকান্ত এবারও স্বরচিত গান গাইলেন।

মন! চল শ্যামা মা-র নিকটে, মা মোর অগতির গতি বটে।
যার যা বাসনা, মনেরি কামনা, সেখানে সকলই ঘটে॥
অন্নপুণ্যভরা, সাজিয়ে পশরা, এনেছ ভবের হাটে;
যা কর উপায়, পাঁচে মিলি খায়, কলঙ্ক তোমারই রটে॥
কার রাজ্য লয়ে, আনন্দিত হয়ে, রাজত্ব কররে পাটে।
আছে একজনা লইতে খাজনা, জমি যে বিকায় লাটে॥

ডাকাত সর্দারের গাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে। কেবলই মনে পড়ে, যা কর উপায়, পাঁচে মিলি খায়, কলঙ্ক তোমারই রটে। অনুশোচনায় তস্কর সাধু হল। হাত জোড় করে বলে—ক্ষমা কর; দয়া কর।*

* * *

ক্ষমা পেয়ে দস্যুদল লুঠের টাকাকড়ি কমলাকান্ত'র পায়ে রাখল। তিনি গ্রহণ করবেন না কিন্তু সর্দার নাছোড়বান্দা।

*শ্রীশ্রীকালী কুণ্ডলিনী গ্রন্থে লিখিত আছে সঙ্গীত শুনিয়া দস্যু নির্দয় হৃদয়, নির্দয়তা পরিহরি মানিল বিস্ময়। দস্যু ঘোরা চিরকাল পিয়ার পাসর, ভক্ত তুমি প্রেমপূর্ণ তোমার অন্তর। এত বলি পড়িল কমল পদতলে, দয়া কর ক্ষমা কর অন্ত সব বলে।

ডাঙ্গা পেরিয়ে প্রথমে যে গাঁ পেলেন সেখানে কমলাকান্ত রাত কাটালেন। পরদিন সকালে পৌছলেন অমরাগড়। এখন আর গড় নেই শুধু একটি বিশাল ঢিবি। ইংরেজ সরকারের নির্দেশে খোঁড়াখুঁড়ি হয়েছিল। ঢিবি থেকে কিছু দূরে গ্রাম।

গাঁয়ে ঢুকেই কমলকান্ত ডাকাতদের দেওয়া টাকাকড়ি অন্ত্যজ শ্রেণীর দরিদ্রদের বিলিয়ে দিচ্ছেন। ভিড় লেগে গেল। এক বৃদ্ধা ভিড় ঠেলে আসতেই পারছেন না। কমলাকান্ত তাঁর কাছে গেলেন। বৃদ্ধা হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন—রাজপণ্ডিত হও।

কমলাকান্ত রক্ষাকালীতলায় যে কেনারাম চট্টোপাধ্যায়কে আসবার কথা দিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে উঠলেন। গাড়ু গামছা এল।

তিনি মুখ হাত ধুলেন।

কেনারাম সংবাদ পেয়ে ত্বরায় মাঠ থেকে ফিরলেন। এবং সাদর অভ্যর্থনা জানালেন কমলাকান্তকে। বাড়ির ভদ্রাসন সংলগ্ন কুঠরিতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হল।

* * *

এক সন্ধ্যায় আগমবাগীশ ও কতিপয় ভদ্রজন এলেন কেনারামের বৈঠকখানায়। তাঁরা বসলে কমলাকান্ত তাঁদের সঙ্গে বসলেন। আলাপ পরিচয় চলছে, ভৃত্য দুটি থেলো হুঁকোয় তামাক সেজে নিয়ে এল। একটি হুঁকো ব্রাহ্মণদের জন্যে।

কিছুক্ষণ পর মোড়ল মহাশয় বললেন—কৃষ্ণপক্ষের রাত। ঘণ্টাটেক বাদে চাঁদ ডুববে। আর দেরী না করে কথকতা আরম্ভ হোক। তাইলে সবটা শুনে আলায় আলায় ফিরতে পারব।

আগমবাগীশ হুঁকোটি নামিয়ে ইষ্ট নাম জপ করলেন। তারপর জয়ধ্বনি দিলেন। কথকতা সুরু করতে গিয়ে কয়েক পলক ভাবলেন। তারপর বলছেন—তন্ত্রক্রমের কথা আপনারা শুনেছেন?

—শুনেছি।

—উত্তম। তাহলে জ্ঞানের কথা বলি। পরজ্ঞান বোধাত্মক। অর্থাৎ বোধের দ্বারা প্রকাশ করে। কী প্রকাশ করে ?

—ঈশ্বর তত্ত্ব মেলে বললেন।

—অপরজ্ঞান সৃষ্টির বাগাত্মক। অর্থাৎ কথায় জীব ও জগৎ তত্ত্ব প্রকাশ করে। এই দুই জ্ঞান সৃষ্টির উন্মেষকাল থেকেই নিম্নমুখী। যুগে যুগে জীব পেয়ে আসছে এই জ্ঞান ?

—কোন সাধনায় ? কমলাকান্ত প্রশ্ন করেন।

—জ্ঞানের সকল সাধনায়। আগমবাগীশ দৃষ্টি প্রসারিত করলেন —আমি তন্ত্রসাধনার কথা বলব। এবং পরজ্ঞান লাভের।

সমবেত ভদ্রজন মনোযোগী হলেন।

আগমবাগীশ বলছেন—সাধনার প্রথম অবস্থায় অহঙ্কারভূমিতে পরমবোধ অস্ফুট থাকে। দ্বিতীয় অবস্থায় পশ্যন্তীভূমিতে আন্তরপরামর্শ উদিত হয়। তৃতীয় অবস্থায় মধ্যমাভূমিতে গুরুশিষ্য ভাবের সাহায্যে গুপ্তজ্ঞান প্রকট হয়। এবং চতুর্থ অবস্থায় বৈখরীভূমিতে জ্ঞান শাস্ত্রের রূপ ধারণ কর।

ব্রাহ্মণগণ তন্ত্রবিষয়ে কমবেশী অবহিত। একজন প্রশ্ন করলেন— অহংজ্ঞান, আন্তরপরামর্শ, গুপ্তজ্ঞান কী একের পর এক আসে ?

—না। এই আবির্ভাব ঐতিহাসিক ক্রমের ব্যাপার নয়। আবির্ভাব, অবস্থান তিরোভাব ওতপ্রোত।

—আর এক কথা।

—বলতে আজ্ঞা হয়।

—তন্ত্রেভেদ কেন ?

—শিবশক্তির সম্বন্ধভেদের জন্য। শিবের স্বরূপ কিন্তু এক।

—আগমতন্ত্র কয়টি ?

—দশটি। কামিক, যোগজ, চিন্ত্য, মুকুট, অংশুমান্, দীপ্ত, অজিত, সূক্ষ্ম, সহস্র এবং সুপ্রভেদ।

কমলাকান্ত মন দিয়ে শুনছেন।

কেনারামের তন্ত্রশাস্ত্র সংগ্রহ মন্দ নয়। এর অনেকগুলি তাঁর স্বহস্তে অনুলেখন। মল্লারপুর, তারাপীঠ, বক্রেশ্বর গেলে বন্ধুবান্ধবের পুঁথি পড়েছেন। ভাল লাগলে বসে গেছেন নকল করতে।

কমলাকান্ত ছয়মাস সেগুলি পড়ছেন। সকালে এটাই প্রথম কাজ। পাঠের পর গান। তিনি গাইতে বসলে কেনারাম সঙ্গত করেন। বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সঙ্গীতচর্চা চলে।

আজ বিঘ্ন ঘটল। বাহির থেকে সিধুপাগলা ডাকছে। এমন হাঁকডাক যেন বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। কমলাকান্ত বেরিয়ে এলেন। পাগলা বলল—কীরে! বাড়ি যাবি না?

—এইতো বেশ আছি।

—তাতো আছিস। মা যে যায় যায়।

কমলাকান্ত'র বুক কেঁপে উঠল। মায়ের কী হয়েছে? ব্যাধি না অপঘাত? না সিধুপাগলা রহস্য করছে? বললেন—ঠিক বলছ তুমি?

—ঠিক কি বেঠিক অম্বিকে গেলেই দেখতে পাবি। যা যা বাড়ি যা।

গ্রামের লোক বলে সিধুপাগলা সিদ্ধপুরুষ। কমলাকান্ত অবিশ্বাস করতে সাহস পেলেন না। তিনি বাড়ি ফিরতে উদ্যোগী হলে কেনারাম এত সামগ্রী উপহার দিলেন যে কমলাকান্ত'র সাধ্য নেই বহন করার। তিনি কেবলমাত্র রামপ্রসাদের গানের পুঁথি আর তানপুরা নিলেন।

* * *

বর্ষাকাল। সারাদিন জলভরা কালো মেঘ আকাশ ঢেকে রয়েছে। কমলাকান্ত চুপচাপ শয্যাশায়ী জননীর পাশে বসে আছেন।

মহামায়া শীর্ণ ঠোঁট নাড়লেন—কমলাকান্ত।

—মা।

—সংসার ছাড়িস না। মহামায়া ডানহাতখানি পুত্রের হাতের ওপর রাখলেন।

নিরুত্তাপ, কর্কশহাত তবু কী সুখস্পর্শ। কমলাকান্ত'র দেহ জুড়িয়ে যায়, মন অবশ হয়ে আসে। আশৈশবের স্মৃতি হৃদয় মন্থন করে। তাঁর মনে হল এ তো সামান্য হাত নয়, এ যে এক অপার্থিব আশ্রয়।

কমলাকান্ত আবেগের গলায় বললেন—মা, মাগো, তোমার অবাধ্য আমি কোনদিন হব না।

মহামায়া শান্তিতে চোখ বুঁজলেন।

শিষ্যরা তাদের পণ্ডিতের মাতৃদায় নিজেদের মনে করে যথাসাধ্য সাহায্য করল সুতরাং ক্রিয়াক্রর্মের কোনই হানি হল না। শ্রাদ্ধ-শান্তির পর কমলাকান্ত সস্ত্রীক চান্নায় গেলেন। ওখানেই থাকবেন এবার।

অম্বিকার ভদ্রাসন, বৈঠকখানা, গোয়াল, ক্ষেতখামার, প্রিয়শিষ্য আগলে বসে রইল। গুরুমশাই যেদিন গুরুমাকে নিয়ে অম্বিকায় ফিরবেন সেদিন যেন কোন অসুবিধা না হয় তাঁর।

[দুই]

চান্না। কমলাকান্ত কখনও নদীতীরে কখনও শ্মশানে কখনও বিশালাক্ষী মন্দিরে বসে থকেন। মনে ভাব এলে চিন্তা করেন আবার গানও করেন।

এক হেমন্তের বিকেল। কুহেলিবিলীন দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কমলাকান্তর মনে ভাব এল। তিনি ধীরলয়ে গাইছেন —'নয়ন! কি দেখরে বাহিরে, তুমি আগে দেখ আপনারে, এখনি জুড়াবে তনু রে, প্রবিশ অন্তরে।'

অকালে মেঘের ওপর মেঘ জমছে। বৃষ্টির সম্ভাবনা। তিনি বিশালাক্ষীমন্দিরে প্রবেশ করলেন।

মন্দির অভ্যন্তরে দীপশিখা নিবাত নিষ্কম্প। কমলাকান্ত আসন বের করে বসলেন। অমনি স্থির হওয়ার চেষ্টা করলেন। দেহে ও মনে চঞ্চলতা। পারলেন না। তখন বাইরে এসে গভীর গলায় গাইছেন—'তড়িত জড়িত ঘন, বরিষে আনন্দবন, সতত ষোড়শী শশী অমিয় বিতরে। সে রসে বিরস কেন, কররে আমারে ॥'

সাধক কমলাকান্ত'র খেদ, সতত যে আনন্দ, অমিয়, এবং রস ঝরছে, তার থেকে তিনি বঞ্চিত কেন?

মেঘ কেটে আকাশে চাঁদ উঠল। সন্ধ্যারাতির ঘণ্টা বাজে। বাতাসে মাধবীর সুগন্ধ। কী মধুর এই পৃথিবী। রূপ, মধুর শব্দ মধুর, গন্ধ মধুর। কমলাকান্ত অন্তর দিয়ে মধুরিমা গ্রহণ করতে প্রয়াসী হন। শুধু চোখে দেখা কানে শোনা নয় অন্তরে মধুরের স্পর্শ পেতে চান।

সহসা কমলাকান্ত'র মনে শিহরণ জাগল। তিনি চোখ বন্ধ করলেন, তবু চাঁদের আলো। তিনি কানে আঙুল দিলেন, তবু ঘণ্টাধ্বনি। তিনি নাক টিপে ধরলেন, তবু মাধবীর গন্ধ।

এ শুধু মুহূর্তের জন্য। আনন্দ কেবলই কমলাকান্ত'র কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায়। তিনি দেবী বিশালাক্ষীর ধ্যান করলেন কিন্তু আর সেরকম হয় না। তখন সাধক কবি গান ধরলেন—'আমার মন উচাটন কেন হয় মা! স্থির তো না রহে তব শ্রীচরণে। মাতিল মাতঙ্গসম গো অঙ্কুশ না মানে॥ না জানি সাধন বিধি, হয়েছি মা অপরাধী, সে কারণ মম মন, চঞ্চল সমনে। কাতর হয়েছি অতি, স্থির কর মম মতি, কমলাকান্তের প্রতিমা হের গো নয়নে॥'

গান গাওয়ার পর কমলাকান্ত রোদন করলেন।

*　　*　　*

রজনীর দ্বিতীয় যাম। কমলাকান্ত'র চোখে ঘুম নেই। যার মনে ঈশ্বরলাভের উৎকট ইচ্ছা তার নিত্য জাগরণ।

বধূ ঘুম ভাঙলে ভীতা হরিণীর ন্যায় তাকান। একী! স্বামী শয্যায় উপবিষ্ট, গায়ে আচ্ছাদন নেই। তিনি সযত্নে একটি কম্বল

পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিলেন। কমলাকান্ত বাধা দিলেন না। তখন বধূর মনে সাহস এল। বললেন—তোমার কী হয়েছে?

—বুঝতে পার না?

—পারি। তুমি তন্ত্রে দীক্ষা নাও।

—আর তুমি?

—অনুমতি হলে আমিও নেব।

—বিশালাক্ষীর তান্ত্রিক বলেছেন, তারাপীঠে শ্মশানবাসী সিদ্ধ কৌল আমার গুরু। আমি তারাপীঠ যাব। তোমাকেও নিয়ে যাব।

বধূ স্বস্তির শ্বাস ফেললেন। কী ভাগ্যি তাঁর।

পরদিন। কমলাকান্ত বিশালাক্ষী মন্দিরের সেই তান্ত্রিককে প্রশ্ন করলেন—তান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্য কী?

—শক্তির উদ্বোধন। মন তখন আর বহির্মুখ থাকে না। মনের নিবৃত্তি এবং বিষয়ের চিন্ময়তা প্রাপ্তি ঘটে।

—সে কেমন?

তান্ত্রিক বিশদভাবে কমলাকান্তকে জীবের সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগরণ বোঝান।

—সুষুপ্তি অবস্থায় স্থুল জীবন যাপন। আহার, মৈথুন ও নিদ্রা। পরনাদরূপিনী চৈতন্যের প্রভাবে স্বপ্ন সুরু হয়। কবি শিল্পী যে স্বপ্ন দেখে সেই স্বপ্ন। এই হল অর্ধজাগরণ। তখন মন অন্তর্মুখী আবার বহির্মুখী।

কমলাকান্তের চোখের মণি নড়ল। তিনি তাহলে অর্ধজাগ্রত। জেগে জেগে মগ্ন স্বপ্ন দেখেছেন।

তান্ত্রিক বললেন—মন আরও অন্তর্মুখী হলে পূর্ণজাগরণ ঘটে। তখন এক অহংপ্রতীতি বিশ্বব্যাপী। এই অবস্থাই সুপ্রবুদ্ধ অবস্থা।

—তা কী সম্ভব?

—প্রবুদ্ধ থাকতে পারলে মহাশক্তির প্রভাবে সুপ্রবুদ্ধস্থিতি অবশম্ভাবী।

কমলাকান্ত একাগ্রমনে প্রতিটি কথা শুনেছেন, বিদ্যা বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতেও চেষ্টা করছেন। তবু তাঁর কাছে তন্ত্র রহস্যই থেকে যায়।

তান্ত্রিক কমলাকান্ত'র মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন—আর কিছু বোঝ আর নাই বোঝ, এটা তো বোঝ যে, 'আমি' আছে বলেই সব। এই আমিটাকে তুমি ধরতে পার। পার না সেই আমি অর্থাৎ ঈশ্বরকে ধরতে। তন্ত্র বলছে, সেই আমি আছে বলে এই আমি রূপ রস গন্ধ স্পর্শের বিষয় ভোগ করে। আর বলেছে ভোগ থেকে ত্যাগ, প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্তি, স্থূল দেহবোধ থেকে সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্ভব।

—সম্ভব, কিন্তু গুরুর সাহায্য প্রয়োজন।

—অবশ্যই। তুমি আর কাল বিলম্ব না করে তারাপীঠ যাও। এমন কিছু দূর নয়। বিশক্রোশ। অমরাগড় হয়েই যেতে পারবে।

—আপনিও চলুন।

—বেশ।

তান্ত্রিক তারাপীঠ যেতে সম্মত হলেন।

* * *

গুরু কে, এ প্রশ্নের উত্তর গুরুপ্রণামে আছে। তৎপদং দর্শিতং যেন এবং চক্ষুঃ উন্মীলিতং যেন, সেই গুরুকে আমার প্রণাম। পরমপদ দেখানো আর জ্ঞানচক্ষু খুলে দেওয়া একই কথা।

অমরাগড়ের পথে তান্ত্রিকমশাই আর কমলাকান্ত গুরুতত্ত্ববিষয়ে আলোচনা করছেন।

তান্ত্রিক : মানুষ প্রতিকূল শক্তির অধীন।

কমলাকান্ত : শুধু প্রতিকূল শক্তি ?

তান্ত্রিক : অনুকূল শক্তিও আছে। প্রথমে প্রতিকূল শক্তির কথা বলি। শ্বাসপ্রশ্বাস, প্রাণ ও অপানের ক্রিয়া, সুখ দুঃখ বোধ, মান-অপমান, আপন পর জ্ঞান, যাবতীয় দ্বন্দ্বভাব প্রতিকূল শক্তি হতে উদ্ভূত। এই প্রতিকূল শক্তি অতিক্রম করতে না পারলে মনে শান্তি আসে না।

কমলাকান্ত ঃ মনে শান্তি না থাকলে সাধনা অসম্ভব।

তান্ত্রিক ঃ যথার্থই তাই। গুরুর উপদেশ অনুযায়ী ক্রিয়াকৌশলে অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তির প্রথমে আসে সমন্বয়। দুই শক্তি মধ্যবিন্দুতে সাম্য অবস্থায় থাকে।

কমলাকান্ত ঃ তখন কী হয়?

তান্ত্রিক ঃ তখন এক অচিন্ত্য তেজের উদ্দীপন। তখন কাব্য-সাধক মহাকাব্য রচনা করেন, শিল্প-সাধক মহৎ শিল্প সৃষ্টি করেন এবং সঙ্গীত-সাধক মহানসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

কমলাকান্ত ঃ আর ঈশ্বর সাধক?

তান্ত্রিক ঃ গুরুর উপদেশ অধীন হয়ে উর্ধ্বগতি লাভ করেন।

দুজন নীরবে পথ হাঁটেন। স্ব স্ব চিন্তায় বিভোর। কমলাকান্ত ভাবছেন সিদ্ধকৌলের কথা। যখন এক গাঁয়ের সীমানায় এসেছেন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী বললেন—গুরু দীক্ষা ও উপদেশ দিলেও শিষ্যের কর্তব্য করণীয় আছে।

—যেমন?

—দীক্ষারূপ ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে পৌরুষ-অজ্ঞানের বিনাশ হয় কিন্তু বুদ্ধিগত অজ্ঞানের হয় না। তার জন্য সাধকের চেষ্টা, সংযম, অভিনিবেশ, আত্মবিশ্বাস প্রয়োজন। আরও এক কথা।

তান্ত্রিক চুপ করে থাকলে কমলাকান্ত বললেন—কী সে কথা?

—গুরুর মহিমাময় স্বরূপ চিন্তা। সেটা এমন হবে যে তাঁর শক্তিতে কণামাত্র অবিশ্বাস থাকবে না। সেটা তোমার আমার সম্বন্ধে সম্ভব নয়, তাই আমি তোমার গুরু হতে পারি না।

কমলাকান্ত বাক্যহারা।

হাঁটতে হাঁটতে দ্বিতীয় যে গাঁ পেলেন সে গাঁয়ে রাত কাটালেন দুজন। সকাল হলে আবার হাঁটা।

শীতের সকাল। কেনারাম রোদে পিঠ দিয়ে তেল মাখছিলেন। এরপর স্নান, পুষ্পচয়ন, পূজা এবং একাদশীর উপবাস। এ ভাবেই

তিনি রোগ দূরে রেখেছেন। নিরোগ দেহ না হলে ধর্মসাধনা হয় না।

কেনারাম একনজরেই কমলাকান্তকে চিনতে পারলেন। দৃষ্টিশক্তি এখনও প্রখর। তাঁর মুখে প্রসন্নতা ছড়িয়ে গেল। বললেন—কী সৌভাগ্য আমার।

—সৌভাগ্য আমারও। কমলাকান্ত স্মিত হাসলেন।

আজ একাদশীর উপবাস, সুতরাং অতিথিদের জন্য কেনারাম ফলাহারের ব্যবস্থা করলেন। মর্তমান কলা ও নলের গুড়ের সন্দেশ।

আহারাদির পর বিশ্রামকালে কমলাকান্ত আগমনের উদ্দেশ্য জানালেন। কেনারামের ইচ্ছে হয় তারাপীঠ যাবার। কিন্তু উপায় নেই। ধানকাটা হচ্ছে, পাটা চলছে। মাড়াই বাঁধা হতে দিন পনেরো কুড়ি লাগবে। এতদিন কমলাকান্তকে আটকানো অনুচিত। শুভস্য শীঘ্রম্।

সন্ধ্যায় যথারীতি গ্রামের পঞ্চজন এলেন। শাস্ত্র আলোচনা হয়। গান বাজনা হয়। কমলাকান্ত ইমনরাগে গাইলেন—'মা, আমি কি করিলাম ভবে আসিয়ে, সফল মানব দেহ বিফলে খোয়ালাম। সবেমাত্র এই হল, মিছে কাজে দিন গেল, আপনি পাইলাম দুঃখ, জননীরেও দিলাম॥'

গানের শেষে কমলাকান্ত'র চোখ থেকে দুফোঁটা জল পড়ল। মাতৃভক্ত সন্তানের বড় দুঃখ যে মায়ের মনে কষ্ট দিয়েছে উদাসীন থেকে।

এরপর অমরাগড়ের মোড়ল গান ধরলেন—'দেহি মে আনন্দ আহ্লাদিনী। তুমি প্রেমময়ী প্রেমের মহাজন, তব প্রেমে আমি রয়েছি ঋণী।'

এ চটুলগীত নয়, ভাব আছে। তবে প্রচ্ছন্ন। গান শেষ হলে মোড়ল বললেন—চাটুজ্জে, কেমন লাগল?

—চমৎকার। মধুর ভাবের গান। হ্লাদিনী শক্তির আরাধনা। তা মোড়ল, শক্তির প্রথম প্রকাশ কোনরূপে?

—রমণীরূপে।

—না। কেনারাম মাথা নাড়লেন—জননীরূপে। তন্ত্র বলছে, শক্তির আদিতে শিব প্রসূতি।

—শিবের সঙ্গে রমনী ছাড়া শক্তি কী ভাবে সৃষ্টি করে?

—ও কথা যদি বল, তাহলে আমি বলব রমণী এল কোথা থেকে?

যখন উভয়ে বাকবিতণ্ডা করছেন তখন সিধুপাগলা বলে—শোনো। সে এক রহস্য। গাছ থেকে বীজও বটে, বীজ থেকে গাছও বটে।

—সে কেমন? কমলাকান্ত জিজ্ঞেস করেন।

—সে এক রহস্য। আদিতে শক্তি যা প্রসব করলেন তা হল জ্ঞান। অহম্ অস্মি, এইজ্ঞান, শক্তির লৌকিক প্রসব নয়। জ্ঞান শক্তির সহিত সম্পৃক্ত থাকে কার্য ও কারণের ন্যায়। জ্ঞানশক্তি সমন্বয়ে এক হল বহু।

কমলাকান্ত বিস্ফারিত নয়নে সিধুপাগলাকে নিরীক্ষণ করছেন। এ তো যে সে ব্যক্তি নয়।

সিধুপাগলা হাসে—কিছু বুঝলেন মহাশয়েরা?

—বুঝা কী সহজ? কেনারাম বললেন—তুমি যা বললে তা কামধেনুতন্ত্রে আছে। জানি কিন্তু বুঝি না।

—তা ঠিক বলেছেন বাবা। জানা এক আর বোঝা আর। কামিনীতত্ত্ব বোঝা বড় কঠিন। জায়া হয়েও জননী। পাগলা হাসেন আমার মা আমার বাবার বউ, আর আমার বউ আমার ছেলের মা। একেব হি মহামায়া নামভেদং সমাশ্রিতা।

*　　　*　　　*

তারাপীঠ। দীর্ঘ চার বছর এখানে থাকার পর কমলাকান্ত বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন। দীক্ষা হয়নি। আবার এসেছেন। মন্দির—সম্মুখে শ্মশান, জঙ্গলও রয়েছে। একটি শ্বেত শিমুলগাছের তলায়

পঞ্চমুণ্ডির আসন। সিদ্ধকৌল ধ্যান করছেন। অদূরে কমলাকান্ত এবং তাঁর স্ত্রী। একাসনে।

এবার তাঁদের শিবতন্ত্র মতে দীক্ষা। শাস্ত্রে আছে দীয়তে জ্ঞান-সদ্‌ভাবঃ, ক্ষীয়তে পশুবাসনা। দানক্ষপন সংযুক্তা দীক্ষা তেনহি কীর্তিতা। যার দ্বারা জ্ঞান হয় ও পশুবাসনার ক্ষয় হয় সেই ক্রিয়ার নাম দীক্ষা। তার তিনটি ক্রম।

প্রথমতঃ সময়দীক্ষা। সিদ্ধকৌলের উপদেশ মত সময়ী কমলাকান্ত আগমশাস্ত্রী আচার বা চর্যা পালন করলেন ও ধ্যান অভ্যাস করলেন। তিনি যোগ্যতা লাভ করলে জাতি উদ্ধার ক্রিয়া যথাবিধ সম্পন্ন হল। ক্রিয়ার প্রভাবে কমলাকান্ত'র দেহের সূক্ষ্মতম অবয়বসংস্থানে পরিবর্তন হতে থাকে। এরপর সিদ্ধকৌল মন্ত্র দ্বারা কমলাকান্তের দেহ শুদ্ধ করলে, তাঁর দ্বিজত্বলাভ হল। তিনি এখন রুদ্রাংশতা লাভের অধিকারী। সিদ্ধকৌল ঊর্দ্ধমার্গীয় রেচকক্রিয়া দ্বারা নিজশরীর থেকে বেরিয়ে কমলাকান্ত'র শরীরে প্রবেশ করলেন। কমলাকান্ত'র চৈতন্য শিথিল, দেহ মন প্রাণ রশ্মিমাত্র সম্বন্ধিত। সিদ্ধকৌল চৈতন্যের অবগুণ্ঠন মোচন করে সম্যক্ আকর্ষণ করলেন। তারপর ঊর্দ্ধপুরক দ্বারা নিজের অন্তরাত্মায় ফিরে এলেন।

দ্বিতীয়তঃ সাধকদীক্ষা। শিবধর্মিনী ও লোকধর্মিনী। বিশ্বধর্মী দীক্ষার প্রভাবে সাধকের মন্ত্রপদপ্রাপ্তি ঘটে। সাধক কমলাকান্ত মন্ত্র আরাধনা পরায়ণ হয়ে গুরুর অদেশমত হোম জপ ও পূজা করলেন। সিদ্ধকৌল জানতে চাইলেন গৃহস্থ না যতি হতে তাঁর ইচ্ছা। কমলাকন্ত'র মাতৃ আদেশ মনে পড়ল। নির্দ্বিধায় বললেন—গৃহস্থ।

তৃতীয়তঃ বিদ্যাদীক্ষা। বত্রিশবর্ণাত্মক মন্ত্রই বিদ্যা এবং সদাশিবপদ বিদ্যাত্মক।

এই দীক্ষায় সাধক কমলাকান্ত'র সদাশিব পদে যোজনা হল। তিনি বিদ্বান্ ও কষ্ট সহিষ্ণু। সহজেই জ্ঞানলাভ করলেন ও ক্রিয়াসিদ্ধ হলেন।

দীক্ষান্তে অভিষেক হবে শিষ্যেরও গুরুর। পাঁচটি কলস, ধূপ, দীপ ও গন্ধপুষ্প সংগৃহীত হয়েছে। দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব ও ঈশান কোণে কলসগুলি ক্রমশঃ স্থাপিত হল। কমলাকান্ত প্রথম তিন কলসে কলান্যাস করার পর ঈশান কোণের কলসে এবং সবশেষে পূর্বকলসে কলান্যাস করলেন। তিনি প্রতি কলসকে আরাধ্য মন্ত্র দ্বারা সকলীকরণ করলেন এবং সাধ্যমন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করলেন। অনুরূপ পর্যায়ে সিদ্ধকৌল। পাঁচ কলসে পাঁচতত্ত্ব ও পাঁচকলান্যাস করার পর পঞ্চভুবনেশ্বরকে স্থাপন করলেন। এবং পরমেশ্বরের অর্চনা করলেন।

এবার অভিষেক। সুপরিকল্পিত মণ্ডলটি স্বস্তিকাদি চিহ্ন দ্বারা অলঙ্কৃত, চন্দ্রাতপ দ্বারা আচ্ছাদিত এবং ধ্বজা দ্বারা শোভিত হল। মধ্যস্থলে অনতিউচ্চ চন্দনকাঠের পীঠস্থান। তার ওপর গুরুশিষ্য অনন্তাসনে বসলেন। কমলাকান্ত ঈশানমুখী। সিদ্ধকৌল তাঁকে গন্ধপুষ্পাদি দিয়ে অর্চনা, দীপ জ্বালিয়ে আরতি ও পূর্ণকলস দিয়ে নির্মন্থন করলেন। তারপর কলসের মন্ত্রপূত বারি কমলাকান্ত'র মাথায় ঢেলে অভিষেচন করলেন।

কমলাকান্ত নববস্ত্র ধারণ করে যোগপীঠে উপবিষ্ট হলে সিদ্ধকৌল ঘোষণা করলেন—আমি এই ব্যক্তিকে অভিষিক্ত করিয়াছি। এই ব্যক্তি এখন শিবশক্তির উপদেশ করিবে।

পাঁচটি কলস হোমাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হল।

[তিন]

আঠারশো খৃষ্টাব্দ।

বর্ধমানের মহারাজা তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর সভাপণ্ডিতের খোঁজ করছেন, উপযুক্ত ব্যক্তি পাচ্ছেন না। তিনি চান এমন একজন যিনি তন্ত্রসাধনায়

সিদ্ধ এবং তন্ত্রব্যাখ্যায় সক্ষম। তন্ত্রবিষয়ে একটি পুঁথি লেখানো তাঁর ইচ্ছা। তিনি চুপীর দেওয়ান রঘুনাথ রায়কে আজ্ঞা করলেন কমলাকান্ত'র সন্ধান করতে।

রঘুনাথ রায় অম্বিকায় খোঁজ করে কমলাকান্তকে পেলেন না। তখন চান্নায় গেলেন। বিশালাক্ষী মন্দির প্রাঙ্গণে পা দিতে দেওয়ান অবাক। এই কমলাকান্ত।

দীক্ষিতসাধক কমলাকান্ত পঞ্চমুণ্ডীর আসনে নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির। ধ্যানস্থ। কার ধ্যান করছেন?

শিব, শক্তির। শিব কর্তা, শক্তি করণ। আর বিন্দু পঞ্চকলার আধার, অঘটন ঘটন পটিয়সী মায়া। বিন্দুক্ষোভে মায়িক বিষয়ের সৃষ্টি। বিষয়ভোগে জীব আসক্ত। সে শক্তির সহিত নিত্য নিমীলিত শিবকে উপলব্ধি করতে যত্নশীল নয়।

শিবশক্তির প্রতি যত্নশীল কমলাকান্ত'র বাহ্যজ্ঞান নেই। তিনি গণ্যমান্য দেওয়ানজীর উপস্থিতি টের পাচ্ছেন না।

মুগ্ধ রঘুনাথ রায় প্রহর গোণেন।

স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করলে কমলাকান্ত তাকালেন—দেওয়ানজী।

—আপনাকে বর্ধমান নিয়ে যেতে ইচ্ছুক।

—যাব। অপেক্ষা করতে হবে।

—কতক্ষণ?

—জানিনা। দুপাঁচ বছরও লাগতে পারে।

—ঠিক আছে।

রঘুনাথ রায় চুপী ফিরে গেলেন।

* * *

অমারজনীর মধ্যযাম। শিবাগণ কিছুক্ষণ আগে প্রহর ঘোষণা করেছে। এখন চরাচর স্তব্ধ। জাগতিক শব্দ শোনা যায় না কিন্তু আছে।

বিন্দুক্ষোভের ফলে যে শব্দের উৎপত্তি তা তিনপ্রকার। সূক্ষ্মনাদ, অক্ষর ও বর্ণ। বর্ণাত্মক শব্দই কানে শোনা যায়। তা এখন নেই কিন্তু অতীন্দ্রিয় অক্ষর ও সূক্ষ্ম নাদ আছে। কমলাকান্ত তা অন্তরে অনুভব করছেন। কালোত্তর তন্ত্রের উক্তি : স্থূলং শব্দ ইতি প্রোক্তং সূক্ষ্মং চিন্তাময়ং ভবেৎ। সূক্ষ্মনাদ চিন্তাময়।

কমলাকান্ত'র চিন্তা উদ্বেলিত হল। তিনি আসন ত্যাগ করে ত্বরায় বাড়ি ফিরলেন।

নিঃশব্দ বাড়ি। পীড়িতা সহধর্মিনী মারা গেছেন একটু আগে। বুঝি হেলায়। যখন কমলাকান্ত'র অন্তর উদ্বেলিত হয়েছিল তখন।

[চার]

দীর্ঘ আঠ বছর কেটে গেছে। আঠরশো নয় খৃষ্টাব্দ। তন্ত্রসিদ্ধ কমলাকান্ত'র বয়স এখন প্রায় চল্লিশ। তিনি সুপ্রবুদ্ধ অবস্থায় সুখাসীন। তিনি শক্তিকে জাগিয়েছেন। তিনি শিবশক্তি উপলব্ধি করেছেন। তিনি কৈবল্য আনন্দের অধিকারী। তবু তাঁর নিত্য জাগরণ। সিদ্ধ হলেও সাধক। সাধনার শেষ নেই।

দুপুরবেলা। কমলাকান্ত গৃহিণীহীন গৃহে বসে গান করছেন—'আদর করে হৃদে রেখো, আদরিণী শ্যামা মাকে। তুমি দেখো আমি দেখি আর যেন মন কেউ না দেখে॥' এই গান আর 'মজিল মন ভ্রমরা' কমলাকান্ত'র বড় প্রিয়।

এক প্রহর বেলা। কমলাকান্ত গাইছেন, মাতুলবংশীয় ধর্মদাস মুখোপাধ্যায় সঙ্গত করছেন। ভৃত্য বিষ্ণু রাঁধাবাড়ায় ব্যস্ত। এমন সময় সেই দেওয়ান আবার এলেন।

—ঠাকুর, আদেশ করুন।

—আমি যাব। কমলাকান্ত কথা দিয়ে দিলেন।

—কোথায় যাবে? ধর্মদাস দুজনের মুখোমুখি হলেন—আমাদের ছেড়ে কমলাকান্ত'র কোথাও যাওয়া চলবে না।

ধর্মদাস ভালবাসেন কমলাকান্তকে। এই ভালবাসার মূলে সঙ্গীত। কমলাকান্ত গীতরচনা করলে তিনি সুর লয় সঙ্গত করে বিশালাক্ষী মন্দিরে কীর্তন করেন। দুজনের আনন্দে দিন কাটে।

কমলাকান্ত বন্ধুকে বললেন—তুমিও চল। রাজাকে একবার দেখে আসি।

অল্পসময়েই চান্নায় রটে গেল গমনবার্তা। কমলাকান্ত'র চতুষ্পাঠীর ছাত্ররা ছুটে এল। তারা যেতে দেবে না।

গ্রামের প্রধান বললেন—বিশালাক্ষীর এমন সেবাইত পাব কোথায়? তোমার যাওয়া হবে না।

তবু কমলাকান্ত বর্ধমান গেলেন।

*　　　*　　　*

মহারাজা তেজশ্চন্দ্র সাধক কবিকে অতি সমাদরে সভায় গ্রহণ করলেন। পাদ্য অর্ঘ্য দেওয়া হল। তাঁর বসবার আসন স্থির হয়েছে রাজসন্নিকটে।

রাজসভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, ভূস্বামী, যোদ্ধা, পণ্ডিত, গায়ক, উপস্থিত। তাঁরা কমলাকান্ত'র গুণাবলী শুনলেন। একপণ্ডিত জিজ্ঞাসা করলেন—কাটোয়ার চারক্রোশ পশ্চিমে সিউর গ্রামে কী মহাশয়ের নিবাস?

কমলাকান্ত মাথা নাড়লেন।

রাজকর্মচারী রাধানাথ বসু বললেন—সিউর গ্রামের কমলাকান্ত জাতিতে করণ। পিতার নাম ব্রজকিশোর। তিনি বৈষ্ণব সাধক।

মহারাজা কমলাকান্ত'র গান শুনতে উৎসুক। তিনি কমলাকান্তকে স্বরচিত পদ কীর্তন করতে বললেন। কমলাকান্ত কিছুক্ষণ গুন গুন করার পর গাইলেন—বামা কে রে এল চিকুরে, বিহরে আনন্দময়ী শবহৃদি পরে। বসন নাহিক গায়, পদ্মগন্ধে অলি ধায়, চলে যেতে টলে

পড়ে আসব ভরে ॥ যে ঠেকেছে রাঙ্গাপায়, হত দিতি সুতচয়, স্পর্শ-মাত্র শিব হয় সমর মাঝারে। কমলাকান্তের ভাষি, সর্বনাশী ধরে অসি, করিলি সব কাশীবাসী জনমের তরে।'

এ গানের ইতিহাস আছে। চান্নায় থাকা কালে ঘনঘোর শ্রাবণ নিশীথে বিদ্যুৎ চমকালে কমলাকান্ত মুহূর্তের জন্য বিবসনা সদালসা বাগদী যুবতীকে দেখেছিলেন। সে দেখা এমনই যে তাঁর মনে ভাব আসে। এবং তিনি ভুবনমোহিনী নারীরূপ দর্শন করেন। কেশরাশি আকাশে আলুলায়িত, নীলকান্তিবদন মেঘের গায়, আভূমিলম্বিত বিদ্যুৎলতা শরীর, চরণযুগল জলস্রোতের উপর খেলা করে। রূপ দেখে বিহ্বল কবি গেয়ে ওঠেন—'বামা কে রে এল চিকুরে।···

সামান্যা নারী সাধক কবির চোখে অসামান্যা দেবী হয়ে গেল।

*　　　*　　　*

বর্ধমানের বাঁকা নদীর পাড়ে কোটাল হাট। এখানে জলস্রোত, তরুলতা, শ্মশান, নির্জনতা সবই আছে। কমলাকান্ত'র জন্য কোটাল হাটে বাড়ি তৈরী হল, মন্দিরও। রাজআনুকূল্যে কমলাকান্ত'র কোন অভাবই নেই। অনুগত ভৃত্য এবং মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থাও হয়েছে।

রাজসভাপণ্ডিত কমলাকান্ত দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ করলেন। এ বিবাহ স্বতন্ত্র।

গৃহস্থের গৃহিণী গৃহম্ উচ্যতে। আর তন্ত্রসাধকের নাস্তি ভার্য্যা সমোলোকে সহায়ো ধর্মসংগ্রহে। সাধন সহায়িনী ভার্য্যা তন্ত্রশাস্ত্রে শক্তি ও প্রিয় অন্তরঙ্গিনী পদবাচ্যা।

এবার কমলাকান্ত রক্তাম্বর ধারণ করলেন। তান্ত্রিক সন্ন্যাসী শক্তিগ্রহণ করলে এই বেশ। তন্ত্র মতে সন্ন্যাসী অথবা গৃহীর শক্তি গ্রহণ বড়ই উদার। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তন্ত্রসার গ্রন্থে এবং ব্রহ্মানন্দ গিরি 'শাক্তনন্দ তরঙ্গিনী' গ্রন্থে বাশিষ্ঠ পদ্ধতি অবলম্বনে শৈব বিবাহের নির্দেশ দিয়েছেন। তান্ত্রিক সমাজে শৈব বিবাহের বহুল প্রচলন। এই বিবাহে মগ, পাঠান তিব্বতী রমণীগণও শাক্ত ব্রাহ্মণের শক্তি

হয়েছেন। স্বয়ং ব্রহ্মানন্দ গিরির শক্তি ছিলেন এক রূপসী পাঠান রমণী।

*　　　　*　　　　*

কাঞ্চনপুরের শক্তিকে নিয়ে কমলাকান্ত কোটলহাটের মন্দির বাড়িতে বসবাস করছেন।

মন্দির বাড়ির দুদিকে দুটি কুঠরি। একটি জপের ঘর। মালা, ঝুলি, কাঁথা ও লাঠি কোণে থাকে। ঘরের মাঝখানে পঞ্চমুণ্ডির আসন। অপরটি বাসের ঘর, এখানে কমলাকান্ত'র শক্তি থাকেন।

মন্দিরটি প্রস্থে এগারো দৈর্ঘ্যে বাইশ হাত। মেঝে বাঁধানো, ছাতটি টিনের দোচালা। মন্দিরে কালিকা মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। পূজা হয় হোম হয়। কমলাকান্ত রজনীর মধ্যযাম থেকে প্রত্যূষকাল পর্যন্ত ধ্যানস্থ থাকেন।

কার্তিক মাস। বাতাসে শীতের ধার। কমলাকান্ত খোলা গায়ে বসে আছেন। তাঁর মনে গান এল। তিনি তালি দিয়ে গাইছেন—
'ভাল ভাব ভেবেছ রে মন। তোর ভাবের বালাই যাই। তোর ভাবে ভব-ভবানী, ভবনে বসে পাই॥ ঐভাবে ভুলে থাকো, ভাবান্তর হয়ো না কো, মন ভাবিলে রে ভবের ভাবনা কিছুই নাই॥'

গাইতে গাইতে কমলাকান্ত'র চোখে জল এসে যায়। যিনি সুখ দুঃখের অতীত তাঁর চোখেও জল।

*　　　　*　　　　*

রাজা তেজশ্চন্দ্র সভাপণ্ডিত কমলাকান্তকে জানালেন দীর্ঘদিনের ইচ্ছা। সুললিত ছন্দে একখানি তন্ত্রসাধন পুঁথি প্রণয়ন করতে হবে।

কমলাকান্ত চিন্তিত হলেন। আগম-নিগম মিলে একশত বিরানব্বুই খানি তন্ত্র। তার চৌষট্টিটি সংগ্রহ করে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ 'তন্ত্রসার' প্রনয়ন করেছেন। সে এক বিশাল গ্রন্থ। তাই নিয়ে কাব্য সম্ভব?

মহারাজ আগ্রহের চোখে কমলাকান্ত'র মুখপানে তাকিয়ে আছেন। তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষের অসাধ্য কী?

সাধক কবি মৌন সম্মতি জানালে তেজশ্চন্দ্র ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। কৃতজ্ঞতায় ভরে গেছে তাঁর মন।

দিন যায়।

কমলাকান্ত উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় মন্দির প্রাঙ্গণে পদচারণা করেন। শক্তি অপলক তাকিয়ে থাকেন স্বামীর মুখের দিকে। চিন্তামগ্ন কমলাকান্ত তাঁকে দেখেও দেখেন না। তাঁর কত স্থান মনে পড়ে। অম্বিকা, চান্না, অমরাগড়, তারাপীঠ। কত জন মনে পড়ে। তান্ত্রিক, কেনারাম, সিধুপাগলা, সিদ্ধকৌল। কত কথা মনে পড়ে। অনাদি সুষুপ্তি, মন্ত্ররহস্য, শক্তিপাত, কুণ্ডলিনীতত্ত্ব।

আজ কমলাকান্ত শক্তিকে ভাল করে নিরীক্ষণ করলেন। করে এক অনুভূতি হল। তিনি স্থির করলেন, প্রাণসৃষ্টিকারিণী ব্রহ্মস্বরূপা আদ্যাশক্তিকে কামিনী রূপেই সাধন বৃত্তান্তে বর্ণনা করবেন। আপন মহিমায় নারী ভাস্বর হয়ে উঠুক।

এদিকে শক্তি লজ্জায় আনতমুখী। তিনি তো আর সাধনবৃত্তান্তের খবর রাখেন না। তিনি নারী এইমাত্র।

সাধক কমলাকান্ত পরম মমতায় তাঁর চিবুক স্পর্শ করলেন—বউ।

শক্তি সুপ্তোত্থিতার ন্যায় মুখ তুললেন— আমি মা হতে চলেছি।

যা সামান্য কথা তাই কমলাকান্ত'র কাছে অসামান্য বাণী। তিনি উদ্দীপন বোধ করেন অন্তরে।

শক্তি মৃদু হেসে বললেন—যাই সন্ধ্যার উপকরণের আয়োজন করি।

—পুঁথি ও দোয়াত কলম রেখো।

—আর কিছু?

কমলাকান্ত মাথা নাড়লেন।

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর। সুরাপান শেষ হলে কমলাকান্ত লিখতে বসেছেন। ধীর স্থির। গুরুবন্দনার পর লিখলেন—

নিরাকার ব্রহ্মের আকার দেখ মায়া।
প্রকৃতির তিনগুণ গুন ধরে কায়া॥
যে কারণে কামিনী করিয়া নিরঞ্জনে।
বর্ণিব বৃত্তান্ত কথা ব্রহ্ম দরশনে॥
অন্তঃজজন আর ভক্তির লক্ষণ।
বিস্তার করিব ছয় চক্র বিবরণ॥
তার মধ্যে প্রকাশ করিব যোগতত্ত্ব।
সমাধি অজপা মন্ত্র ব্রহ্মের মহত্ত্ব॥
বিষয় বিষের কাঁটা পশ্চাৎ খুলিব।
গুরু উপদেশ জ্ঞান প্রকাশ করিব॥
কমলাকান্তের এই অভিলাষ।
ভাষা পুঞ্জে সাধকরঞ্জন পরকাশ॥

* * *

কমলাকান্ত বাঁধাধরা নিয়মে সাধনবৃত্তান্ত লিখছেন না। ইচ্ছা হলে বেশ কয়েক পাতা লিখলেন, নাহলে পুঁথি একপাশে পড়ে রইল। তিনি পাত্রের পর পাত্র সুরা পান করছেন।

লোকমুখে রাজা তেজশ্চন্দ্র শুনলেন, কমলাকান্ত সুরাপানই করেন আর কিছু করেন না। রাজা স্বচক্ষে দেখার জন্য কোটালহাট এলেন এবং দেখলেন যথার্থই তাই। বললেন—ঠাকুর কলসে কী?

—দুধ।

—কই দেখি।

—দেখুন। কমলাকান্ত কলস থেকে পাত্রে ঢাললেন।

রাজা দুধই দেখলেন কিন্তু প্রত্যয় গেলেন না। বললেন—এ দুধে কী ঘি হয়?

—অবশ্যই। কমলাকান্ত দুধ জ্বাল দিলেন—এই দেখুন সর পড়ছে। এবার সর তুলে ঘি করব। সেই ঘি হোমাগ্নিতে আহুতি দেব। আপনি দেখুন।

রাজা দেখছেন। কমলাকান্ত পূর্ণাহুতি দেবার সময় বললেন—এই পূর্ণাহুতি দিলাম। অদ্যাবধি আপনার রাজবংশে কোন বংশধর জন্মাবে না।

ঋষি দুর্বাসার ন্যায় কমলাকান্ত রাজা তেজশ্চন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন।

মহারাজ তেজশ্চন্দ্র যুগপৎ বিস্ময়ে ও শঙ্কায় হতবাক। সুরার দুধে পরিবর্তন বিস্ময়ের কথা আর নির্বংশ অভিশাপ শঙ্কার কথা।

মহারাজ চলে গেলে কমলাকান্ত অনুতাপ করেন। আজ আর পুঁথি লেখা হল না।

* * *

নদীপাড়ে শ্মশান ভূমি। চারদিকে পোড়া কাঠ, ভাঙ্গা কলস আর ছেঁড়া কাপড়। শুধু একটি জায়গা পরিষ্কার।

মধ্যরাতে কমলাকান্ত সেই জায়গায় আসন পেতে বসলেন। শ্মশানে বৈরাগ্যে ভাব আপনি এসে যায়। কে.জানে এজন্যেই হয়ত তান্ত্রিক সাধকের শ্মশান বড় প্রিয় স্থান।

কমলাকান্ত স্থিরচিত্তে ইষ্টনাম জপ করছেন। দৃষ্টি ভ্রূযুগলের মধ্যবিন্দুতে সন্নিবিষ্ট। তদ্‌গতভাবে বললেন—সাধন কারণ মন নিমগণ কুরু রূপে।

—রূপ কী?

কমলাকান্ত চকিত হলেন। কার কণ্ঠস্বর? রজনীর মধ্যযামে অন্ধকার শ্মশানে কে এল? নির্ভীক সাধক উত্তর দিলেন—রূপং বিন্দুঃ ইতি খ্যাতং। কুণ্ডলিনী বেষ্টিত বিন্দুই রূপ।

ছায়ামূর্তি এগিয়ে এল। অন্ধকার হলেও বোঝা যায়। দীর্ঘকায় ক্ষীণদেহ, যুবকবয়স, মাথায় পাগড়ি আছে। কমলাকান্ত বললেন—কে তুমি?

—যুবরাজ প্রতাপচন্দ্র।

—কী চাও?

—আত্মজ্ঞান। আপনি আমাকে দীক্ষা দিন।

—তোমার পিতার অনুমতি আছে?

—আছে।

—উত্তম। আগামী অমারাত্রে দীক্ষার উপকরণ নিয়ে এই শ্মশানে উপস্থিত থাকবে।

যুবরাজ ভক্তিভরে কমলাকান্তকে প্রণাম করলেন। তাঁর মনের ইচ্ছা বাবার মত কানে মন্ত্র নেওয়া নয় তার চেয়ে অনেক বেশী গভীর।

কমলাকান্ত পুনর্বার ধ্যানে বসলেন। প্রাণ ও অপানবায়ু নিয়ন্ত্রিত করে মূলাধারে প্রসুপ্তা কুণ্ডলিনীশক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করলেন। অচিরে তাঁর নির্বিকল্প সমাধি হল।

সমাধি হল পরম সাম্যাবস্থা, পরমাত্মায় স্থিতি। এই অবস্থায় বিশ্বচরাচর চিন্ময়। অনন্ত বৈচিত্র্য অথচ সব একাকার।

রজনী প্রভাত হলে কমলাকান্ত চোখ মেলে তাকালেন। পূর্ব আকাশে লোহিত আভা। সূর্য উঠছে। তিনি আসন ত্যাগ করে দাঁড়ালেন। মনে পড়ল সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সাধকের স্ত্রী হওয়ার কত যে যন্ত্রণা। শক্তি সারারাত তাঁর অপেক্ষায় জেগে কাটিয়েছেন।

তিনি প্রাতঃকৃত্য সেরে ত্বরায় বাড়ি ফিরলেন।

* * *

সাধকও রক্তমাংসের মানুষ। স্বাভাবিক অবস্থায় ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা ইত্যাদি বোধ থাকে। কমলাকান্ত'রও আছে। তিনি খেতে বসলে শক্তি মুড়ি কলাইসেদ্ধ গুড় দিলেন।

খেতে খেতে কমলাকান্ত বললেন—তুমি কী বাপের বাড়ি যেতে চাও?

—এখন না।

—কেন?

—আমি গেলে তোমার খাওয়াদাওয়ার অসুবিধা হবে।

কমলাকান্ত'র মন প্রসন্নতায় ভরে গেল। তিনি প্রীতির চোখে তাঁর শক্তিকে দেখলেন। আর দেখতে দেখতেই তাঁর মনে কবিতার পদ এসে যায়। তিনি আঁচিয়ে পুঁথি নিয়ে বসলেন। লিখলেন—

হেরি হেরি সুন্দরী চকিত নয়ান।
তড়িত সুচঞ্চল করি অনুমান॥

সাধক কবি অন্তঃজ জন ব্যাখ্যা করছেন। সুন্দরী হল কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। তাঁর অনুমান, শক্তির দৃষ্টিপ্রসাদ বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল আর কেলিসুখও তাই। শিবশক্তির মিলন মুহূর্তের। উত্থিতা শক্তি চকিতে মূলাধারে ফিরে যায়। তিনি লিখলেন—

কেলি সমাপন গমন নিবাস।
কমলাকান্ত অপরিমিত আশ॥

প্রথম অধ্যায় শেষ করে কমলাকান্ত মুখ তুললেন। শক্তি কুয়োতলায় স্নানের উদ্যোগ করছেন। মাথার চুল খোলা। কমলাকান্ত লিখতে সুরু করলেন।

গজপতি নিন্দিত গতি অবিলম্বে।
কুঞ্চিত কেশ নিবেশ নিতম্বে॥
উরসি সরসীরুহ রামা।
করিকর শিখর নিতম্বিনী বামা॥
নাভি গভীর নীরজ বিহার।
ঈষৎ বিকচ কমলকুচ ভার॥

* * *

এই রকমসময় শব্দে ও সুললিত ছন্দে কমলাকান্ত দুরূহ তন্ত্র সাধনা ব্যাখ্যা করছেন। স্থূল উপমা সূক্ষ্ম উপমেয়। লিখলেন—

চিরদিন অন্তর সীতা পতি পায়।
পরম উল্লাস লসিত বরকায়॥

বরকায় অথবা বরাঙ্গ অর্থে যোনি। যেমন সতীর যোনি পতি

পেয়ে পরম উল্লসিত তেমনি সাধকের অন্তরের অবস্থা শিব পেয়ে।
কমলাকান্ত দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ করলেন—

সহচরী সঙ্গে প্রবেশই নারী।
কমলাকান্ত হেরি বলিহারি॥

শক্তি স্নান সেরে সিক্ত বসনে শয়নকক্ষে প্রবেশ করছেন। তাই দেখে কমলাকান্ত'র মনে ভাব উদ্দীপ্ত হল। তিনি তৃতীয় অধ্যায় সুরু করলেন।

কামিনী প্রবেশ কৈল কামান্তক বাসে।
কত শত সঙ্গিনী সাজিল চারি পাশে॥

এরপর কমলাকান্ত অতি নিপুণ কামিনীর অঙ্গের আভরণ সাজসজ্জা ও প্রসাধন বর্ণনা করে লিখলেন—

কামাদি কুসুম ছয় তুলে নিল হাতে।
ধর্মাধর্ম দুটি ফল আরোপিল তাতে॥
আঠ ফুলে সঙ্গিনী বান্ধিয়ে দিছে থোপ।
পায়ের ঘর্ষণে সে কামিনী করে লোপ॥

এসব সাধনতত্বের কথা। অতি গভীর। বলা হচ্ছে, অন্তঃ-জনের চরম অবস্থায় ছয় রিপু ঝরে পড়ে, থাকে ধর্ম আর অধর্ম মিলিত অবস্থায়। সাধকের কাছে দুইই সমান।

শক্তি থালায় অন্ন ব্যঞ্জন সাজাচ্ছেন। আয়োজন এমন কিছু নয় কিন্তু তা দেখে কবি-কল্পনা উদ্দাম। তিনি তত্ত্ব-সুন্দরীর উপচার বর্ণনা সুরু করলেন—

সুন্দরী সাজায় সবে দিয়া উপহার।
যতনে জোগায় ভক্ষণের উপচার॥
অন্নের সহিত দিল অনেক ব্যঞ্জন।
একমুখে কেমনে করিব নিরূপণ॥
কমলাকান্তের কথা কামরিপু সখি।
নিরখিয়ে নির্ম্মল হইল দুইটি আঁখি॥

কমলাকান্ত অন্তঃজ্ঞ জন শেষ করে খেতে বসলেন।

*　　　　*　　　　*

মাস যায়। দশমাস দশদিন পরে শক্তি কন্যা প্রসব করলেন। রক্তমাংসের সুন্দর একটি পুতুল। কাঁদে হাত-পা ছোঁড়ে দিনে দিনে বড় হয়। এই পুতুলের প্রাণ আছে।

এদিকে পুঁথিরও কলেবর বাড়ে। সাধক ভক্তি লক্ষণ তিন অধ্যায়ে শেষ করেছেন। বাল্যভাব, মধ্যাবস্থা, উত্তমাবস্থা।

বাল্যভাব এই রকম। ইহতনু অবশ দিবস রজনী, রমনী পুণঃ আঁখি ভুলায়। প্রথম অবস্থায় শরীর বশে থাকে না, রমনী বারবার দৃষ্টি বিভ্রম করে। তাহলে কী করা যায়?

কমলাকান্ত নিবেদই রে মন।
রাখহ মোর বিধান।
সো কুরু জো অভিলাষই
সুন্দরী ভুলহি ভাবহু আন॥

কমলাকান্তের নিবেদন রে মন! যা অভিলাষ তাই কর। করে মনে ভাব আন।

যখন মনে ভাব এল তখন মধ্যঅবস্থা। কমলাকান্ত লিখছেন

কদম্ব কুসুম জনু　　সতত শিহরে তনু
যদ বধি নিরখিলাম তারে।

কামিনী দর্শনে সাধকের শরীরে কদম ফুলের মত কাঁটা দিয়েছে। তিনি কামিনীকে ভুলতে চেষ্টা করলে নিজেকেই ভুলছেন।

যদি পাসরিতে চাই　　আপনা পাসরে যাই
এনা দুখ কহিব কাহারে।

কমলাকান্ত দীর্ঘ কবিতায় সাধকের মনের দুঃখ ব্যক্ত করে লিখছেন

রমনী রসের নিধি　　যদ্যপি মেলায় বিধি
কি করে কিঞ্চিৎ কায় দুখ।

সামান্য শারীরিক দুঃখকষ্টে কী এসে যায়। রসের নিধি পেলে সব পরিশ্রম সার্থক। কমলাকান্ত লিখলেন

আমি তারে না ছাড়িব দেখি কত দিনে পাব
দিন যাবে দুখে আর সুখে।

সাধক উত্তম অবস্থায় উপনীত। কমলাকান্ত আনন্দে লিখলেন

সে কামিনী কেমন কামরূপা হেন
কি গুন বান্ধিলে মোরে।
আমি যে দিকে নেহারি তিথি সে সুন্দরী,
আসিয়ে উদয় করে ॥

উত্তম অবস্থায় সকলি সুন্দরীময়।

* * *

কমলাকান্ত মেয়েকে আদর করছেন, যুবরাজ প্রতাপচন্দ্র উপস্থিত। বললেন—চলুন, পঞ্চবটিতে যাই।

সাধন ভজনের সুবিধার জন্য কমলাকান্ত মন্দিরবাড়ি সংলগ্ন জায়গায় বট, অশোক ইত্যাদি গাছ লাগিয়ে পঞ্চবটি রচনা করেছেন। গ্রীষ্মে মনোরম স্থান। শীতল এবং ছায়াবহুল।

পঞ্চবটিতে পৌঁছে কমলাকান্ত দেখলেন, মৎস্য মাংস ও মদ্যের বিপুল আয়োজন, তন্ত্র ক্রিয়ার অন্যান্য উপকরণও রয়েছে। এক রাজকর্মচারী সঙ্গীকে বলছেন—নারী নিয়ে কী সাধনা হয়? প্রশ্ন কমলাকান্ত'র কানে গেল। তিনি সহাস্যে বললেন—হয়। নারী শক্তিস্বরূপিনী। শ্রদ্ধার চোখে দেখলে নারী সাধনার পরম সহায়।

—কী রকম শ্রদ্ধা?

—যেমন কালীকে।

—কালী কী নারী?

কমলাকান্ত এক পলক ভাবলেন। তারপর বললেন—গান শোন, বুঝতে পারবে।

বলে গান ধরলেন—'জান না রে মন। পরম কারণ, কালী কেবল

মেয়ে নয়। মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়॥ হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি, দনুজতনয়ে করে সভয়। কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়।'

রাজকর্মচারী গানে মুগ্ধ হয়ে বিহ্বল তাকিয়ে থাকেন।

পঞ্চবটী ছেড়ে কমলাকান্ত শ্মশানে চললেন। যুবরাজ প্রতাপ পশ্চাতে। গুরু শিষ্যের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ। উভয়ে সুরাপান করে চক্রে বসলেন। আর তেজাশ্চন্দ্র?

একমাত্র তনয়ের দেখি ব্যবহার,
মহারাজ তেজশ্চন্দ্রে বিরক্তি অপার।
ভবিষ্যতে যে রক্ষা করিবে বর্ধমান,
বৃথা ধর্ম নামে সেই মত্তের সমান,
শ্মশানে বসিয়া সে করে সুরাপান;
এতকালে গেল রাজবংশের সম্মান॥

*　　*　　*

সাধক কমলাকান্ত রাজবংশের সম্মান নষ্ট করছেন না। তিনি উপযুক্ত আধারে শক্তি সঞ্চার করছেন।

প্রতাপ কুণ্ডলিনী তত্ত্ব বুঝতে চাইলে কমলাকান্ত সাধকরঞ্জন থেকে পড়ছেন

মেরুদণ্ড পাশে　　উজ্জ্বল প্রকাশে
রবি শশী দুই জনা।
ইড়া বামস্থানে　　পিঙ্গলা দক্ষিণে
মধ্যে নাড়ী সুষুমনা।

এইভাবে আরম্ভ করে কমলাকান্ত নাড়ী নির্ণয় করলেন। এরপর ষট্‌চক্র নির্ণয়। তিনি পড়ছেন—

ধ্বজমূল দেশে　　কমল প্রকাশে
স্বাধিষ্ঠান যারে কহে

সিন্দুরের আভা অষ্টদল শোভা
বাদি পুরন্দর তাহে ॥…

স্বাধিষ্ঠান চক্রের পর মণিপুর চক্র।

নাভি সরোবরে শিখর মাঝারে
জলদ জিনিয়া কায়।
নবীন কমল শোভে দশদল ॥
ড ফ দশাক্ষর তায় ॥
মণিপুর নামা তাহে অনুপমা
ত্রিকোণ মণ্ডল সাজে।
জিনি দিনবধু র কার সবিন্দু
শোভে বৈশ্বানর বীজে ॥…

মণিপুর চক্রের পর অনাহত চক্র।

দেখ বহ্নি মাঝে কমল বিরাজে
অনাহত অভিধান।
বাণ তিন ফল তাহে অনুকূল
ক ঠ দল পরিমাণ ॥…

অনাহত চক্রের পর বিশুদ্ধ চক্র।

বিশুদ্ধ নামেতে চক্র বসে কণ্ঠ দেশে।
ধূম্রবর্ণ ষোলদল তাহাতে প্রকাশে ॥
অকারাদি ষোড়শ অক্ষর করে স্থিতি।
ষোলদলে ষোলবর্ণ শোণিত আকৃতি ॥…

বিশুদ্ধ চক্রের পর আজ্ঞাচক্র।

আজ্ঞা নামে চক্র এক ললাটে নিবাস।
দক্ষিণ বামেতে দুটি দলের প্রকাশ ॥
শশীসম কিরণ উত্তম সেই স্থান।
হ কার স কার দুটি দলের প্রধান ॥
অপূর্ব অক্ষর দুটি চক্রেতে নিবাস।
গুরু উপদেশে তাহা করিব প্রকাশ ॥

কমলাকান্ত থামলেন, এক পলক তাকালেন শিষ্যের মুখপানে।
যুবরাজ প্রতাপ বললেন—অক্ষর দুটি কী?

—হ আর স। শোন। কমলাকান্ত আবার পুঁথি থেকে পড়ছেন—

যত্নে কর নাসার শ্বাস নিরীক্ষণ
সদাই মারুত করে গমনা গমন ॥
নির্গত হইলে বায়ু হ কার সঞ্চারে।
সকার শবদে পুণপ্রবেশে অন্তরে ॥
অই দুই অক্ষর বেদের আদি মূল।
হংস মন্ত্র জপে জীব হইয়া ব্যাকুল ॥

প্রতাপের চোখের মণি নড়ল। তা লক্ষ্য করে কমলাকান্ত বললেন —হংকারেণ বহিঃ যাতি সঃ কারেণ বিশেৎ পুনঃ। প্রপঞ্চসার তন্ত্রে হ কার ও স কারের বিশদ ব্যাখ্যা আছে। এবার প্রাণায়ামের কথা।

তিনি আবার পুঁথি থেকে পড়েন

জপে বটে সর্বদা জ্ঞানের নাহি লেশ।
ইহার কারণে দেহী পায় নানা ক্লেশ ॥
গুরু উপদেশে ইহার বিশেষ জানিব।
অল্পে অল্পে সেই বায়ু স্তম্ভিত করিব ॥
স্তম্ভিত করিলে বায়ু মন হবে স্থির।
জরা মৃত্যু জঞ্জাল তেজিবে শরীর ॥
এ কর্ম করিলে হয় মনের দমন।
অনায়াসে অন্তরে হেরিব নিরঞ্জন ॥

কমলাকান্ত শেষ করলেন এই ভাবে।

কামযুক্তা কামিনী তিলেক নাহি ক্ষমা।
একে একে ছয়চক্র ভেদ কৈল বামা ॥

* * *

কমলাকান্ত'র গৃহিণীর প্রসবের পর থেকেই শরীর ভাল যাচ্ছে না।

বৈদ্য নাড়ী দেখে বললেন, সূতিকা। কমলাকান্ত চিন্তিত হলেন। তিনি সংসারের কোন খোঁজই রাখেন না। ফলে শক্তির এই অবস্থা।

শক্তি দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন। মুখের সে লাবণ্য আর নেই রক্তাল্পতার জন্য ফ্যাকাশে হাত পা। শিশু কন্যা বুকের দুধ না পেয়ে কাঁদে।

কমলাকান্ত কন্যার দেখাশোনা করার দাসী নিয়োগ করলেন কিন্তু বেশীদিন রাখতে পারলেন না। কারণ, মহারাজ তেজশ্চন্দ্র হাত গুটিয়েছেন। মাসিক বৃত্তিটুকু সম্বল। তাতে বেহিসেবী কমলাকান্ত'র কুলোয় না।

শক্তির এমন ক্ষমতা নেই যে রাঁধাবাড়া করেন, তবু উঠতেই হয়। কমললাকান্ত তাঁকে নিরস্ত করলেন।

—তোমাকে হেঁসেল ঠেলতে হবে না।

—তাহলে কে রাঁধবে?

—আমি।

—তুমি কখনও রেঁধেছ?

—না রাঁধলেও পারব।

শক্তি ম্লান হাসলেন।

—তা হয় না।

—খুব হয়।

—আমার কথা শুনবে?

—বল।

—তুমি রাজাকে পুঁথি পড়ে শোনাও। তিনি খুশী হবেন।

—পুঁথি এখনও শেষ হয়নি।

—তাহলে শেষ কর। শক্তি বিছানা ছেড়ে উঠলেন। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। মহারাজ প্রসন্ন হলে কোন অভাবই থাকবে না। দাসী, আহার্য, কবিরাজ সবই আসবে।

হেঁসেলে কিছু পাটকাঠি ছিল তাই জেলে শক্তি দুধ গরম করলেন। মেয়েটার বড় খিদে পেয়েছিল দুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

* * *

ষট্‌চক্রের শেষ চক্র বাকী। কমলাকান্ত সহস্রার কথা লিখছেন—

কমল সহস্রদল আধামুখ যার।
পঞ্চাশৎ অক্ষরে দলের ব্যবহার॥

মন ভাল নেই তবু লিখছেন। সাধকের মনসংযম আর নির্লিপ্তভাব অসাধারণ। কমলাকান্ত সাধারণ মানুষের অবস্থা লিখছেন

মায়াপাশে বদ্ধ হৈয়া জীব নাম ধরে।
আপনার ভেদাভেদ আপনি সে করে॥
পাশবদ্ধ হৈয়া সে কর্মের শোধে ঋণ।
কারে বাসে আপন কাহারে বাসে ভিন॥
বিষয় জঞ্জাল জ্বালা বাড়ায় আপনা আপনি।
স্ত্রী পুত্র ধন বলে করে টানাটানি॥

সাধক কবির বুক ব্যাথায় টনটন করে। মায়াবদ্ধ জীবের বড় জ্বালা। এর থেকে কী পরিত্রাণ নেই? তিনি লিখলেন—

কভু গৃহাশ্রম করে সাধন বিশেষ।
গুরু হয়ে প্রকাশে জ্ঞানের উপদেশ॥
নিশ্চয় জানিয়ো এই ব্রহ্ম নিরূপণ।
জ্যোতির্ময় পরম কারণ সেইজন।

* * *

অনেকদিন পর প্রতাপচাঁদ গুরুর কাছে এলেন। কারণ মহারাজ তেজশ্চন্দ্র তাঁকে নিষেধ করেছেন তন্ত্রসাধনা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে। তিনি পিতার আদেশমত কিছুদিন সেরেস্তার কাজ দেখলেন, কিছুদিন কালনা কাটোয়া ঘুরলেন। আর ভাল লাগে না।

প্রতাপ ভূমিষ্ঠ হয়ে গুরু ও গুরুপত্নীকে প্রণাম করলেন। তাঁর শরীর আরও কৃশ, কণ্ঠার হাড় প্রকট। মুখ শীর্ণ কিন্তু চোখ

অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। কুশল সংবাদের পর প্রতাপ বললেন—সাধক রঞ্জন শেষ হয়েছে কী?

—একরকম।

—এখন কী লিখছেন?

—সমাধি নির্ণয়।

—শুনতে ইচ্ছা করি।

কমলাকান্ত পড়তে আরম্ভ করলেন

চঞ্চল চপলা জিনিয়ে, প্রবলা অবলা মৃদু মধু হাসে।
সুমনি উন্মনি লইয়ে, সঙ্গিনী ধাইল ব্রহ্ম নিবাসে॥

প্রতাপ বললেন—অপূর্ব···অপূর্ব। তন্ত্র যে এমন হতে পারে ভাবাই যায় না! এক আধারে শাস্ত্র ও কাব্য।

কমলাকান্ত নির্বিকার। স্তুতি ও নিন্দায় কিছু যায় আসে না। তিনি কুলার্ণবতন্ত্রে কথিত সমাধি, লয়, ক্রমের কাব্যিক বর্ণনা পড়ে শোনালেন। অবশেষে বললেন—কামিনী করিয়ে বর্ণিলাম কথা। নির্বাণ কারণ তিনি বাঞ্ছাসিদ্ধিদাতা॥

প্রতাপ গুরুদেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কালনা গেলেন। তারপর কোথায় যে গেলেন কেউ জানে না।

*　　*　　*

প্রতাপ নিরুদ্দেশ হলে পিতা তেজশ্চন্দ্র এবং গুরু কমলাকান্ত সমান দুঃখী। বুঝি এই দুঃখই দুই বৃদ্ধকে আবার কাছে টানে। আগের মত তেজশ্চন্দ্র কমলাকান্ত'র কালীবাড়ি আসেন, গান শোনেন। রাজ আনুকূল্যে কমলাকান্ত'র অনটন থাকে না।

এমনি দিনে শক্তি কমলাকান্তকে ছেড়ে গেলেন। দামোদরের তীরে চিতা প্রজ্বলিত হল। শক্তিহারা কমলাকান্ত সহসা গেয়ে উঠলেন

কালি সব ঘুচালি লেঠা।
শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন, রাখবি কি না-রাখবি সেটা॥

দুঃখে রাখ সুখে রাখ করব কি আর দিয়ে খোঁটা
আমি দাগ দিয়ে পরেছি, আর
পুঁছতে কি পারি সাধের ফোঁটা ॥

কমলাকান্ত'র কণ্ঠ কান্নায় বুঁজে আসে।

[পাঁচ]

আঠারশো ত্রিশ খ্রীষ্টাব্দের এক শীতকাল। কোটালহাটে পঞ্চবটির গাছগাছালি ধূলিধূসর। শিমুলের পাতায় পাক ধরেছে, ঝরবে এবার।

কমলাকান্ত পঞ্চবটির আসনে বসতে গিয়েও বসলেন না। শীত করে। এই শীত ঋতুর, বয়সেরও। ষাট বাষট্টি হল, মাথার চুল সব সাদা, গায়ের চামড়া ঢিলে। তিনি রোদে পিঠ দিয়ে বসলেন মাটিতে। শ্যামাকান্তের স্ত্রী দেখতে পেয়ে কম্বলের আসন একটি বালিকার হাতে দিয়ে পাঠালেন। বালিকা কমলাকান্ত'র কন্যা।

খুকী আসন পেতে দিলে কমলাকান্ত আসনে বসলেন। কয়েক পলক দেখলেন মেয়েকে কিন্তু কিছু বললেন না। খুকী তার কাকীমার কাছে ফিরে গেল।

কমলাকান্ত চিন্তামগ্ন। প্রায়ই প্রতাপের কথা ভাবেন। সংবাদ, কালনার রাজবাড়িতে প্রতাপ মারা যান বারশো সাতাশ সালের একুশে পৌষ। সে আজ প্রায় দশ বছরের কথা। প্রতাপকে পালকি করে যারা গঙ্গাযাত্রা করে তাদের কেউ বলছে দাহ করা হয়েছিল কেউ বলছে দাহ করা হয় নি। শ্মশানবাসী এক তান্ত্রিক শবদেহ ছিনিয়ে নেয়। প্রতাপ বেঁচে ওঠেন। কমলাকান্ত ভুরু কোঁচকান। একী সত্যি? যদি সত্যি হয় প্রতাপ ফিরে আসছে না কেন?

*　　　*　　　*

কমলাকান্তর কোটালহাটে আর মন টিঁকছে না। শক্তির স্মৃতি পীড়া দেয়। তিনি রাজাকে বললেন, আমি কাশীবাসী হব।

তেজশ্চন্দ্র যাত্রার ব্যবস্থা করছেন, কমলাকান্ত মত পরিবর্তন করে গাইলেন তীর্থ গমন, দুঃখ ভ্রমণ, মন উচাটন হয়ো না রে।

তবু কমলাকান্ত'র মন উচাটন হয়। কিছুদিন পর রাজাকে বললেন কাশী অনেক দূর, ত্রিবেণী নিকট। আপনি ত্রিবেণী যাত্রার ব্যবস্থা করুন।

মহারাজ তেজশ্চন্দ্র তাঁর গুরুদেবের অস্থিরতা বুঝতে পেরেছেন। কর্মচারীকে নির্দেশ দিলেন ব্যবস্থা করতে।

আবার কমলাকান্ত'র মত বদলাল। কর্মচারী নিতে এলে গাইলেন কি গরজে গঙ্গাতীরে যাব। আমি কেলে মায়ের ছেলে হয়ে বিমাতার কী স্মরণ লব ?

কমলাকান্ত কোথাও গেলেন না। শক্তির স্মৃতি নিয়ে বেঁচে রইলেন। তারপর একদিন শক্তির সঙ্গে শিব মিলিত হলেন আর এক লোকে। যেখানে স্ত্রীর চিতা সাজানো হয়েছিল সেখানেই দাহ হল তাঁর নশ্বর দেহ।

ভ্রাতৃবধূ তাঁর জপের থলি আর কাঁথা দামোদরে ভাসিয়ে দিলেন। কী ভাগ্য আমাদের, তিনি পুঁথিগুলি ভাসিয়া দেননি।

———

বামাক্ষ্যাপা

[এক]

আঠারশো সাঁইত্রিশ খ্রীষ্টাব্দ।

কোম্পানীর আমলে বেনিয়ারা গাঁয়ের চাষীদের দুহাতে লুঠছে। মাটির দরে কিনছে ধান। পাঁচসিকে করে দেড়মণি বস্তা। গাড়ি ভর্তি ধান বেচে চাষী যা পায় তাতে সংসার চালাবার মত নগদ টাকার সংস্থান হয় না। সুতরাং সামান্য জমির মালিকদের বড় অভাব।

বীরভূম জেলার আটলা গাঁয়ে সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জমি কম, আবার ছেলেমেয়ে বেশী। চার মেয়ে দুই ছেলে। জয়কালী, বামাচরণ, দুর্গা, দ্রবময়ী, সুন্দরী, রামচন্দ্র। এতগুলি মুখে সারাবছর অন্ন দিতে চাষের ধানের সবটাই লাগে। কিছুই বিক্রী করা হয় না। তাহলে সর্বানন্দ নগদ টাকা কোথায় পান ?

গেরস্থ বাড়িতে গৃহদেবতার পুজো আচ্চা আছে, পালপার্বণ আছে, ব্রতআচার আছে। শত অভাবেও হিন্দু এসব বাদ দেয় নি। সর্বানন্দ পুরুতগিরি করে সিধে পান, দক্ষিণাও। ফলে তাঁর স্ত্রী রাজকুমারীর আঁচলে গ্রাম্য স্বচ্ছলতার চাবিকাঠি।

জয়কালী নয়ে পা দিয়েছে। আজ তার বিয়ে। কচি মুখখানি চন্দনের কৌটা দিয়ে সাজানো। আর কচি শরীর লাল রংয়ের চেলি দিয়ে। ছাতনাতলার পাশে বসেছে বর। তিনি কিন্তু কচি নন। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স মহাশয়ের। তা বামুনের ঘরে এমন বিয়ে অনেক হচ্ছে। কপালে থাকলে জয়কালী করবে স্বামীর ঘর।

দিদি শ্বশুরবাড়ি গেলে বামাচরণ খানিকটা কাঁদল। সাত বছরের শিশু দিদিকে ভালবাসে। কেননা তার সঙ্গেই যা মেলা-মেশা। ভাই

বোনেরা নুনের ভাঁড় তেলের ভাঁড়। বাম কাঁদার পর পাততাড়ি নিয়ে বসল। দুবছর হল হাতেখড়ি হয়েছে, এখনও গণেশ আঁকুড়ি দিতে পারে না। একটু যেন হাবাগোবা।

একথা কেউ বললে রাজকুমারী রাগ করেন। তাঁর ছেলে হাবা-গোবা হবে কেন? শিবচতুর্দশীর রাতে জন্মেছিল। ছেলে তাঁর শিবের অংশ।

আজ সকালে বাম আর পাঠশালা গেলনা। বাড়ির উঠোনে বসে শিব গড়ছে। পেটটি করেছে সুগোল। রাজকুমারী মুগ্ধচোখে দেখছেন ছেলের শিল্পকীর্তি। তাঁর হাতের কাজ বনধ্। উঁচু গলায় স্বামীকে বললেন—দেখ গে, বাম কেমুন শিব গড়েছে।

সর্বানন্দ ভদ্রাসনের চাতালে বসে বেহালা বাজাচ্ছেন। এও এক বৃত্তি তাঁর। গাঁয়েগঞ্জে পালাগানের আসর বসলে তিনি বেহালা বাজান। কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটে।

সর্বানন্দ শিব দেখার পর স্ত্রীকে ব্যস্তমানুষের গলায় বললেন দুভাইকে ধুতি পরিয়ে দাও। বেরুবো উদের নিয়ে।

—কুথা গো?

—তারামায়ের মন্দির। 'রামের বনবাস' পালাগান হবে। সর্বানন্দ উঠলেন ছোটটার গানের গলা আছে। মাস কতক শুনলে উ গাইতে পারবে।

—আর বাম?

—উয়ার গলা মোটা।

রাজকুমারী আর কিছু বললেন না। ছেলেদের মালকোঁচা মেরে ধুতি পরিয়ে দিলেন। মাথার বড় বড় চুল চূড়ো করে বেঁধে দিলেন। মুখ মুছিয়ে দিলেন আঁচল দিয়ে।

সর্বানন্দ ছেলেদের নিয়ে বেরোলেন।

* * *

আটলা থেকে তারামায়ের মন্দির প্রায় একক্রোশ। সবটাই

আলপথে যেতে হয়। তারপর দ্বারকেশ্বর নদী। সেটা পার হতে পারলে মন্দির। নদী পারাপারের সেতু নেই।

এখন শীতকাল। নদীতে জল কম। সর্বানন্দ ছেলেকে কাঁধে নিয়ে জলে নামলেন। বামাচরণ নড়াচড়া করে, সর্বানন্দ ধমক দিলেন। তখন বাম বলে—আমি মায়ের কাছে যাব।

সর্বানন্দ ছেলের স্বভাব জানেন। গোঁ ধরলে রক্ষে নেই। ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে চললেন তারামায়ের কাছে।

মন্দিরের সামনে আটচালায় পালাগানের আসর বসেছে। অধিকারী যেন সর্বানন্দর অপেক্ষায়ই বসেছিলেন, তিনি আসতেই গান আরম্ভ হল। একটি দশবারো বছরের ছেলে রাম সেজেছে। হাতে ধনুর্বাণ। সে কৌশল্যার হাত ধরে গাইছে—'কাঁদিস না মাগো, আবার ফিরব ঘরে। বনবাসে চোদ্দ বছর থাকার পরে ॥'

সর্বানন্দ বেহালায় ছড় টানতে টানতেই ছেলেদের বললেন তোরাও গলা মেলা।

গাইতে গাইতে বামের কী যে হল, কণ্ঠ রুদ্ধ দৃষ্টি স্থির দেহ লুটিয়ে পড়ে। সর্বানন্দ ভয় পেলেন। মৃগীরোগ নাকি? এক জননী উঠে এসে বামের মুখচোখে জল ছিটোলেন। চৈতন্য ফিরল না। তখন সর্বানন্দ বাড়িতে খবর পাঠালেন।

রাজকুমারী পাগলিনীপ্রায় বামকে কোলে তুলে নিলেন। বার কয়েক ডাকতে বাম মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল। মা বললেন—কী হইছিল বাবা?

—রামের জন্য দুঃখু।

—দুঃখু?

—হাঁ মা। চোদ্দ বছর মাকে ছেড়ে কী করে থাকবে। বামাচরণ অপলক মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

* * *

কিশোর স্বভাবতঃ ক্রীড়ায় আসক্ত হয়ে থাকে। বামের কিন্তু

খেলায় ঝোঁক নেই। সে ঘরের কোণে অথবা আমবাগানে চুপ করে বসে থাকে। এতেই তার আনন্দ।

সর্বানন্দ চিন্তিত হলেন। যে বালক শৈশবে ক্রীড়ায় আসক্ত নয় সে কী যৌবনে তরুণীতে আসক্ত হবে? কে জানে, বামের বিয়ে দিলে ফল হয়ত ভাল হবে না।

বাপের চিন্তা এক মায়ের চিন্তা আর। রাজকুমারী তাঁর শিবের অংশ ছেলের জন্য গৌরী আনবার কথা ভাবছেন। সুন্দরীর বিয়েটা হোক তারপর।

সন্ধ্যা। দীপ জ্বেলে রাজকুমারী আসন পেতে বসলেন। ঠোঁট দুটি নড়ে—তারা, তারা।

বামাচরণ বাইরের ঘরে বসে ছিল, উঠে মায়ের কাছে এল। মায়ের গা ঘেঁষে বসে—তুমি যে এত তারা তারা কর, তারা কী শুনতে পায়?

—পায় বৈকি বাবা। রাজকুমারী ছেলের মাথায় হাত রাখলেন—প্রাণভরে ডাকলে নিশ্চয় শুনতে পায়।

রাজকুমারীর গলায় প্রত্যয়ের স্বর। বামাচরণ বিশ্বাস করল মায়ের কথা। বলল—ঠিক আছে, আমি প্রাণভরে ডাকব।

বামাচরণ মাটি দিয়ে কালী গড়ছে। জলে ভুষিগুলে রং করল কালো। ঠোঁটে, জিভে দিল আলতাপাতার লাল রং। তারপর সন্ধ্যা হলে মায়ের মত ডাকতে থাকে—তারা তারা।

সাঁঝ ফুরিয়েছে। রাজকুমারী নামগান শেষ করে হেঁসেলে ঢুকলেন। বাম কিন্তু তারস্বরে ডেকে যায়—তারা তারা। আর এক দৃষ্টিতে কালীর দিকে চেয়ে থাকে। এত ডাকছে, তবু কালী সাড়া দিচ্ছে না।

রাজকুমারী হেঁসেল থেকে উঠে এলেন—বাম বামরে।

—কী। বামাচরণ অভিমানের গলায় বলে—এত ডাকছি তবু সাড়া দিচ্ছে না।

—একদিনে কী হয় বাবা ?

—কিছু তো হয়। খুশী চোখে তাকায়। নইলে সামান্য একটু হাসে। তাই বা কই ?

গর্ভধারিণী মাতা হেসে ফেললেন। কিন্তু বামাচরণের মুখে হাসি নেই। সে কেঁদে ফেলল।

* * *

সুন্দরীর বিয়ে হয়েছে। এবার সর্বানন্দ চেষ্টা চরিত্র করে যুবক পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করতে পেরেছেন। তাই তাঁর মন বেশ হালকা। তিনি বেহালায় কাফি বাজাচ্ছেন।

রামচন্দ্র কলিকাতা থেকে আনানো ছাপা পুস্তিকা পড়ছে। মুক্তোর মত অক্ষর। পড়তে অসুবিধা হয় না। বামাচরণ শুনছে।

সর্বানন্দ বললেন—বাম, তুই পড়।

—উ আমি পড়ব না।

—কেনে ?

—উ সব ম্লেচ্ছ কথা। বামাচরণ বিকৃত স্বরে উচ্চারণ করে—ভজ্জ মন, মেরীমাতার নন্দনে।

সর্বানন্দ হাসলেন।

—ঠিক আছে শাস্ত্র তন্ত্র তো পড়বি। তাই পড়।

বামাচরণ পুঁথি নিয়ে বসল।

সর্বেশ্বর মুনিষ হলেও বাড়ির একজন। সর্বাদন্দ তাকে ছেলের মতই দেখেন। সে বামাচরণ ও রামচন্দ্রের সর্বেশ্বর দা গোমুর্খ হলেও তার লেখাপড়ায় খুব উৎসাহ।

আশ্বিন মাস। এখন চাষের কাজ বিশেষ নেই। সর্বেশ্বর খানিকটা শনের দড়ি পাকাল তারপর হেঁসোখানা কোমরে গুঁজে তালগাছে উঠল পাতা কাটতে। তারপর পুঁথি বানিয়ে বামাচরণকে দিল।

—এই নাও পুঁথি। নিয়ে ইবার পাঠশালে চল।

—আজ থাক।

—কেনে? থাকবে কেনে? রাম পাঠশালে গেল আর তুমি যাবে নাই?

বামাচরণ খুঁটির মত দাঁড়িয়ে থাকে। তখন সর্বেশ্বর বামের পিঠে ছুম্বা বসিয়ে দিল—হাউড়ে চেবা কুথাকার! পাঠশাল যেতে মুটে ইচ্ছা নাই।

বাম বড় বড় চোখ মেলে তার সর্বেশ্বরদাকে দেখছে। কিছুক্ষণ পর সব ঝাপসা হয়ে যায়। কিছুতেই চোখের জল আটকাতে পারে না।

রাজকুমারী আঁচল দিয়ে ছেলের চোখ মুছিয়ে দিলেন। তিনি বলতে বাম আর বেগরবাঁই করে না।

সর্বেশ্বরদা'র কাঁধে চড়ে বাম পাঠশালায় চলল।

গুরুমশায়কে আড়ালে পেয়ে সর্বেশ্বর উদ্বেগের গলায় বলে—বাম তেমুন চতুর নয়। লেখাপড়া হবে উয়ার?

—হবে। তবে অধিক নয়।

—কতটা হবে?

—তা রামায়ণ মহাভারত পড়তে পারবে।

—আর মন্ত্রতন্ত্র?

—তাও বলতে পারবে।

সর্বেশ্বর আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। গুটি গুটি বামের কাছে গেল। মনটা কেমন করছে। জিজ্ঞেস করে—লাগে নাই তো ভাই?

বাম দাগা বুলোতে ব্যস্ত। মাথা নাড়ল। লাগে নি।

* * *

সর্বানন্দ'র বাড়িতে কান্নার রোল উঠছে। কখনও তীব্র কখনও মৃদু। বয়সিনী রাজকুমারী কাঁদছেন আর বিলাপ করছেন—ঘরে ছু-ছুটো কড়ে রাঁড়ি। আমি কী পাপ যে করেছিলাম।

যুবতী জয়কালী নীরবে চোখের জল ফেলছে।

ঘটনা এইরকম। বড়মেয়ে জয়কালী বিয়ের বছরখানেক পর শাঁখা সিঁদুর খুইয়ে বাপের বাড়ি এসেছিল। আজ একইভাবে এসেছে সুন্দরী। বালবিধবা।

বামাচরণ একবার মায়ের একবার দিদির দিকে তাকাচ্ছে। ওর চোখেও জল এসে গেল।

সর্বানন্দ বললেন—আমি আবার সুন্দরীর বিয়ে দেবো।

বামাচরণ যেন অবাক হল। বলে—সুন্দরীর বেলা ইকথা বলছ। কিন্তু দিদির বেলা তো বলো নাই।

—তখুন বিধবা বিয়ার চল হয় নাই।

—এখুন হইছে ?

—হইছে। কলিকাতায় অনেকগুলা বিধবা বিয়ার সংবাদ শুনেছি।

বামাচরণ আর কিছু বলল না। এই ওর স্বভাব। হঠাৎই কথা বলে আবার হঠাৎই চুপ করে যায়। ও ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল।

তারা মন্দিরে এক খ্যাতিমান্ তান্ত্রিক আসন করে বসেছেন। বিশাল বপু তাঁর। গায়ের রং কালো। বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি।

বাম এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে তান্ত্রিকের কাছে এল। মনটা ভাল নেই। মা কাঁদছে, দিদি কাঁদছে।

তান্ত্রিক জয়ধ্বনি দিলেন। তারা নামের মহতী শব্দতরঙ্গ বায়ুমণ্ডলে পরিব্যপ্ত হল। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বামের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন—আয়। তারা মাকে দর্শন করে আসি।

মন্দির অভ্যন্তরে বাম নির্নিমেষ দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে মনের ভার। মনে হচ্ছে, তারা মা বড় আপন।

সর্বানন্দ পুণঃর্বার সুন্দরীর বিয়ে দিতে উঠে পড়ে লেগেছেন। সিউড়ি যাচ্ছেন ঘন ঘন। একবার রামপুরহাটও ঘুরে এলেন। নব্য শিক্ষিত সমাজ তাঁকে ভরসা দিচ্ছে।

কিন্তু আটলার পরিবেশ অনুকূল নয়। সর্বানন্দ'র আত্মীয়স্বজন বিরোধিতা করছে, ভয় দেখাচ্ছে একঘরে করার। তিনি একটি গান বাঁধলেন—'কুলে পড়ুক কালি, ওগো রয়েছে কালী, আমি আর ভয় করি না'।

এ গান রামচন্দ্র শুনেছে কিন্তু বামাচরণ শোনে নি। ও আজকাল বাড়িতে থাকে কম। মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। ঘরের টানের থেকে বাইরের টান যেন বেশী।

দ্বারকা নদীর পাড়ে শ্মশান। রোজই দু একটা মড়া আসে। কোন কোন দিন সাত আঠটা। সেদিন চিতা জ্বলে সর্বক্ষণ।

আজ সেরকম একটা দিন। তিনটি মড়া জ্বলছে চিতায়। বাম স্থির চোখে দেখছে। মানুষ বুড়োলেও মরে নাবুড়োলেও মরে। কার কবে মরণ তার ঠিক নেই।

শ্মশানের কাছেই জঙ্গল। শাল, শিমুল, পলাশ, বাবলা, শিমুল দু জাতের। রক্তশিমুল আর শ্বেতশিমুল। একটার ফুল গাঢ় লাল আর একটার ফিকে। শ্বেতশিমুল বিরল। একটি শ্বেতশিমুলের তলায় সেই তান্ত্রিক বসে রয়েছেন।

বামাচরণ ধীর পায়ে এসে তান্ত্রিককে প্রণাম করল।

—বাবা। আপনি ইখানে?

—হাঁ, ইখানে। কেনে জানিস?

—না।

—ইখানে বশিষ্ঠদেবের পঞ্চমুণ্ডি আসন ছিল। মহাচীনে পঞ্চ-মকার তন্ত্রসাধনা শিখে তিনি ইখানে আসন করেছিলেন। সিদ্ধিলাভ হইছিল।

বামাচরণ কাতর গলায় বলল—বাবা, আমাকে দীক্ষা দেন।

—এখুন নয়। তান্ত্রিক হাত তুলে একটি শিমুল ডাল ভাঙলেন—নে। ঘরে রাখবি। যখুন ডাল শুকায়ে কাঠি হবে, তখুন বুঝবি সময় হইছে। ইখানে আসবি, গুরুর দর্শন পাবি।

বাম বাড়ি ফিরল অপরাহ্ণ বেলায়। বেরিয়েছিল সকালে। রাজকুমারী জিজ্ঞেস করলেন—খেয়েছিস?

—হুঁ। ভোগ খেয়েছি।...বাবা কুথা?

—ঘরে।

—সুন্দরীর বিয়া ঠিক হইছে?

রাজকুমারী মাথা নাড়লেন।

* * *

সর্বানন্দ শয্যাশায়ী। ঘোরাঘুরির অনাচারে অসুখে পড়েছেন। যজমানের বাড়ি যেতে পারেন না। তাই বলে ঠাকুরের নিত্যপূজা বন্ধ থাকে নি।

বামের এখন আঠারো বছর বয়েস। পূজাপদ্ধতি কিছু কিছু শিখেছে, মন্ত্রতন্ত্রও জানা। বাপের কাজ ওরই করার কথা কিন্তু তা হয় নি। কারণ, কোন যজমানেরই বামাচরণের পুজো পছন্দ নয়। শিশু রামচন্দ্রই পুজোআচ্চা করে।

আজ রামচন্দ্র বেরোলে রাজকুমারী বড়ছেলেকে বললেন—বাম, কিছু একটা কর বাবা।

—কী করি বল তো মা। বামাচরণ মুখটা করুণ করল—বড়মা আমাকে হাউড়ে করে তোমার কাছে পাঠালে। না পারি লেখাপড়ার কাজ, না পারি পুজোআচ্চার কাজ।

—তাতে কী। আরও অনেক কাজ আছে। আশপাশের গাঁয়ে খোঁজখবর নে। কাজ একটা ঠিক পেয়ে যাবি। মাহিনা হয়ত তেমন দেবে না। তা না দিক গা, অল্পতেই আমাদের চলবে।

জয়কালী বলল—মাহিনা পেলে কাপাস তুলো কিনে দিস,

তকলিতে সুতো কেটে পৈতে বাঁধব। দুচার পাই তাতেও আসবে।

বামাচরণ দিদির বুদ্ধির তারিফ করল।

সুন্দরীকে নিয়ে হয়েছে সমস্যা। গাঁয়ের একজন ধনীমানুষ তার ওপর নজর দিয়েছে, শাড়ী গয়নার লোভ দেখায়। নবযৌবনা সুন্দরী না শেষমেষ গৃহত্যাগ করে।

রাজকুমারী খুবই ভয় পেয়েছেন। মুমূর্ষু স্বামীকে তিনি কিছু বললেন না কিন্তু বড়ছেলেকে বললেন মনের কথা। বামাচরণ হেঁকোড় দিল—সুন্দরীর ওপর লক্ষ্য রেখো।

সুন্দরীর একলা ঘাটে যাওয়া বন্ধ হল। জয়কালী না হলে রাজকুমারী সঙ্গে যান।

* * *

মুলুটি গাঁয়ে বামাচরণ চাকরী করছে। কাজ সহজ। কালীমন্দিরে পুজোর ফুল তুলতে আর ভোগ রাঁধতে হয়। তবু বিপত্তি।

ভোগের খিচুড়ি বসানো হয়েছে উনুনে। অগ্নিশিখা হাঁড়ির গা বেয়ে ওপরে উঠে যায়। কখনও লোহিত কখনও পিঙ্গল। বামাচরণ মুগ্ধ চোখে দেখছে। কী অশান্ত এই অগ্নিশিখা। পলকের জন্যও স্থির নয়। কেন এই অস্থিরতা? বাম এমনই বিভোর যে পোড়া খিচুড়ির গন্ধ পায় না।

পুরুত মশায় পাশের ঘর থেকে ছুটে এলেন—এই হাউড়ে, গন্ধ পাচ্ছিস না।

আবার খিচুড়ি বসানো হল। এবং কয়েকবার এমন হতে বামাচরণকে শুধু ফুলতোলার কাজ দেওয়া হল। তাতেও বিপত্তি।

ভোরবেলা আকাশে আলো ফুটছে। বাগানে ফুটছে ফুল। যতই আলোর রং বদলায় ততই ফুলের। বাম মোহিত হয়ে দেখছে। কী বিচিত্র এই আলো। কার সৃষ্টি? বাম ফুলগুলি নিরীক্ষণ করে।

এদিকে বেলা বয়ে যায়। পুরুত মশায় চীৎকার করেন—এই হাউড়ে! ফুল তুলবি নাই?

বামচরণ ফুল তুলে সাজি ভরল। চোখের ঘোর এখনও কাটেনি। যেন নেশায় ডুবে আছে। পা টলছে হাত কাঁপছে। ফুলের সাজি আর একটু হলে পড়ে যেত।

এদিকে পুরুত মশায়ের তর সয়না, তাঁকে আরও দু'চার জায়গায় পুজো সারতে হবে। তিনি দ্রুত এগিয়ে এসে বামাচরণের হাত থেকে ফুলের সাজি কেড়ে নিলেন—ফুল তো রোজই ফুটে। উ আর এত দেখবার কী আছে?

—দেখে যে আশ মিটে না ঠাকুরমশাই।

—শোন কথা।

পুরুতমশাই সোজা মন্দিরে ঢুকলেন।

এরপর এক কাণ্ড।

দায় সারা পুজো সেরে পুরুতমশাই বামকে আদেশ করলেন—ভোগটা নিবেদন কর। আমি চললাম।

—যাবেন নাই। বাম চীৎকার করে।

—কেনে?

—পুজো আপনি করেছেন, ভোগও আপনি দেবেন।

—তুইই বা দিলি।

—ভক্তি হীন পুজোয় আমি ভোগ দিতে পারব নাই।

বলিষ্ঠদেহী বাম খরচোখে তাকায়। এই দৃষ্টি পুরুতমশায়ের কাছে অসহ্য। তিনি ভ্রূকুটি করেন। অর্বাচীন বালক ওঁকে ভক্তি শেখাচ্ছে। ঠিক আছে উনিও ভক্তি শেখাবেন।

বামাচরণের চাকরীটি গেল।

* * *

বামাচরণ চাকরী খুইয়ে ফিরে আসতে রাজকুমারীর বুকে মোচড় দিল। টাকা আসা বন্ধ। কিন্তু তিনি ছেলেকে বকাঝকা করলেন

না। বললেন—কীরে! পরের চাকরি পুষাল নাই?

—কী করে পুষাবে? খলের সঙ্গে তো খল হতে পারি না।

—ঠিক আছে। রাজকুমারী ম্লান হাসলেন—চাষবাস দেখ তাইলেই হবে।

বামাচরণ মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ভাবছে ঘরে আমার ছোটমা আর মন্দিরে আমার বড়মা। মা আমার তারা। তারা আমার মা।

বামাচরণের এ বোধ সাধক জীবনে প্রবেশের প্রথম পদক্ষেপ। ও যেন বুঝেছে, মা-ই সব। এমন আশ্রয় আর নেই। কিবা মানবী কিবা দেবী অভয়দায়িনী মঙ্গলকারিণী দুর্গতিনাশিনী।

রাজকুমারী ছেলেকে ভাবতে দেখে বললেন—ভয় কিরে! আমি তো আছি।

—হ্যাঁ মা, তুমি আছ, বড়মা আছে ভয় কী আমার।

বামাচরণ নির্ভয়ে মাঠে গেল।

* *

সর্বানন্দ মারা গেলেন।

পথের ধুলায় বসে বামাচরণ মাকে ডাকে। সে ডাক শুনতে কেউ থমকে দাঁড়ায় না। মানুষ বড় ব্যস্ত নিজেকে নিয়ে।

বাম নামগান করছে আবার কুকুর দেখলে পোঁটলা থেকে মুড়ি দিচ্ছে। খা, যতক্ষণ আছে খা। কোন কোনদিন মুড়ি ফুরিয়ে যায়। সেদিন ওর কপালে সর্বেশ্বরদার কড়াপড়া হাতের চড় চাপড়। তাতে ওর দুঃখ নেই। বলে—হাতে মারবে মারো কিন্তু ভাতে মেরো না।

বামের ভয় ভাতের মারকে। খিদে সইতে পারে না।

কথায় আছে যে ভয়ে পালাও তুমি, সেই মা যোগাস্থা আমি। বামাচরণ যা ভয় করছিল তাই হল! অন্নদায়িনী ধরিত্রীমাতা ওকে ভাতেই মারলেন।

ধরিত্রী মানবসভ্যতার উষাকালে শস্য প্রজননী এবং ভূতধারিণী। তিনি মাতা। মহেঞ্জদরোয় আবিষ্কৃত অনেক মূর্তিই ধরিত্রীমাতার। প্রাচীন মেক্সিকো, গ্রীস ও রোমেও তাই মাতা পৃথিবী মহীয়ং।

আটলার ক্ষেতে এবছর শস্য নেই। আকালে পড়েছে গ্রামের মানুষজন। রাজকুমারী পক্ষীমাতার ন্যায় সন্তানদের মুখে তুলে দিচ্ছেন অন্নকণা। তাও ফুরিয়ে গেল। তখন বললেন—তোরা দুভাই মামা বাড়ি যা। দুটো ভাত তো পাবি।

—আর তুমরা? বাম ও রামের চোখ ছল ছল করে।

—আমাদের উপোস দেওয়ার অভ্যেস আছে।

তিনজন বিধবা বিশুষ্ক চোখ মেলে তাকিয়ে রইল।

বামাচরণের যেতে মন চায় না তবু যাবে। থাকলে মায়ের কষ্ট বাড়বে।

সর্বেশ্বর নবগ্রামে মামাবাড়িতে ছেলে দুটোকে রেখে এল।

* * *

ছায়াহীন তরু যেমন মায়াহীন নারী তেমনি। স্বধর্মে পতিতা। এমনি এক নারী হচ্ছেন বামাচরণের মামী। নিষ্ঠুরা, স্নেহহীনা যন্ত্রণা-দায়িণী। তাঁর হৃদয়ে সুধা নেই। গরলময়ী।

মামী ছেলে দুটোকে গেরস্থালি কাজে উদয়াস্ত খাটিয়ে পেট ভরে খেতে দেন না। তার পরিবর্তে দেন গঞ্জনা। অকর্মার ধড়ি, খড় কাটতে হাত কাটে। ভোজনপটু, একবার ভাত দিলে হয় না। আজ মামী বামকে নিয়ে সাংঘাতিকভাবে পড়লেন।

—এই হাউড়ে। অত ভাবিস কী?

—মায়ের কথা।

—অত যদি মারের ওপর দরদ তো যা না মায়ের কাছে।

—শুনছ? মামী গলা চড়ালেন—তোমার গুণধর ভাগনের বচন শুনছ?

মামা আসুরিক ক্রোধে বামাচরণের পিঠে পাঁচন ভাঙলেন।

রামচন্দ্র বাক্যহারা। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে বামাচরণ ছোট ভাইয়ের হাত ধরল—আয়।

দু'ভাই সুধাময়ী মায়ের কাছে ফিরে এল।

[দুই]

আঠারশো সাতান্ন খ্রীষ্টাব্দ।

সিপাইরা লড়ছে ইংরেজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে। দেশ বুঝি এবার স্বাধীন হয়। ড্যালহৌসী ভয়ে কম্পমান।

সর্বেশ্বর খোল আনতে গরুরগাড়ী নিয়ে মল্লারপুর গিয়েছিল। গঞ্জে সর্বত্র ভয় আর উত্তেজনা। সে দেখে এসেছে রেলগাড়ি ভর্তি গোরা-পল্টন। টকটকে লাল মুখ তাদের। শুনে এসেছে লড়াইয়ের কথা সেপাইরা জিতছে।

একমাস পর সর্বেশ্বর আবার গেল মল্লারপুর। এবার শুনল অন্য কথা। মঙ্গল পাঁড়ের ফাঁসী হবে। সেপাইরা হেরে গেছে।

আটলায় মানুষজন যেমন ছিল তেমনি রয়েছে। চাষারা চাষ করে। তাঁতীরা কাপড় বোনে। বামুনরা পুজো আচ্চা করে। একদিন তারা শুনল, শ্মশানে এক সিদ্ধ কৌল এসেছেন। গলায় তুলসী মালা হাতে রুদ্রাক্ষ। তাঁকে দেখতে সকলে শ্মশান চলল।

* * *

বাংলার সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল নবদ্বীপ। এখানে বৈষ্ণব মত প্রবল থাকলেও আর একটি মত জন্মনিচ্ছে।

পরম বৈষ্ণব মহেশ্বর মৈত্রের বড় ছেলে শ্রীকৃষ্ণানন্দ গোপালের নিত্যপূজা দেখেন আবার আগমেশ্বরী তলায় কালপূজাও দেখেন। তিনি শ্যাম ও শ্যামা মেলাতে যত্নশীল। দীর্ঘকাল বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্র ও শাক্ত তন্ত্রশাস্ত্র অনুধাবন করে তন্ত্রসার ও শ্রীতত্ত্ববোধিনী রচনা করেছেন। বিষয়, দুই শাস্ত্রের সমন্বয়।

শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ স্বপরিকল্পিত দক্ষিণপদ উত্তোলিতা শ্যামবর্ণা। শ্যামা মায়ের পূজা করেন আর আকাশ পাতাল ভাবেন।

বাড়ির কলাগাছে এক কাঁদি কলা ধরেছে। কৃষ্ণানন্দ মাকে ওই কলা মানস নৈবদ্য করলেন। তিনি পূজার দিন বিস্ময়ের চোখে দেখেন কলার কাঁদি নেই। ছোট ভাই সেটি গোপালকে নিবেদন করে বসে আছে। আগমবাগীশের হৃদয় ক্ষোভানলে দগ্ধ হল। তিনি আরাধ্যা দেবীর কাছে গেলেন। আর কে যেন সত্যধর্ম দেখাতে সব আবরণ মুচিয়ে দিল। কৃষ্ণানন্দ দেখলেন শ্যামা-মা শ্যাম ছেলেকে কলা খাওয়াচ্ছেন। মহর্ষি বাল্মীকির ন্যায় তিনি উচ্চারণ করলেন—কৃষ্ণ কৃষ্ণা আনন্দেন ধীমতা।

শ্যাম-শ্যামা সাধনার স্রোত বইল।

*　　　　*　　　　*

শাক্ত বৈষ্ণব ব্রজবাসী কৈলাসপতির বেশভূষার শ্যাম শ্যামা অভেদ ভাবই প্রকাশিত। তিনি বৃন্দাবনে বৈষ্ণবসাধনা শেষ করে শাক্তসাধনা করতে এসেছেন তারাপীঠে। যেমন হরিনাম জপ করতেন তেমনি তারা নাম জপ করছেন।

ব্রজবাসী কৈলাসপতিকে দেখতে বামাচরণ তারাপীঠে উপস্থিত। তিনি মন্দিরের ডাইনে বাঁয়ে গেলেন কৈলাসপতিকে পেলেন না শেষ-মেষ শ্মশানে গেলেন।

*　　　　*　　　　*

আর এক কৈলাসপতি মহাশ্মশানে শিমুলতলায় আসন করেছেন। ইনি কাশ্মীর রাজের গুরু, ভাবুকেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা কাশীধামে দীক্ষিত। তন্ত্র সাধকের বামে বামা রমন কুশলা, দক্ষিণে পানপাত্রম্।

কে এই বামা?

বামা কৈলাসপতির ভৈরবী। নাম শুভঙ্করী, রামানন্দ মণ্ডলের কন্যা। শৈবমতে গৃহীতা তন্ত্রশাস্ত্রের বহিরাচার ক্রিয়াকৌশলে মৈথুনের বিধান আছে। নর শিব স্বরূপে এবং নারী শক্তি স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত

হলে সিদ্ধি এই প্রতিষ্ঠায় একে অপরের সহায়। প্রজননে যেমন তেমন কিন্তু নয়। প্রজননে পশ্বাচার, প্রতিষ্ঠায় বীরাচার। পশ্বাচারে প্রবৃত্তি বীরাচারে নিবৃত্তি।

তন্ত্রাভিলাষী বামাচরণ জীবিত কুণ্ড থেকে অবাক চোখে সাধককে দেখছেন আর ভাবছেন। সাধকের সঙ্গে নারী?

কৈলাসপতি সিদ্ধিকৌল এক পাত্র উষ্ণমাংস বামকে দিলেন—মায়ের প্রসাদ, নে।

বাম মাংস ভক্ষণ করলে সিদ্ধকৌল নরকপালে মদ ঢাললেন। পান শেষে বামকে দিলেন।

পান ভোজনের পর বামের ভালই লাগে। তারা নামে জয়ধ্বনি দিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

* * *

মাতা রাজকুমারীর কত যে ভাবনা জমি জায়গা সবই গেল, ঘরে দু দুটো যুবতী বিধবা, বামাচরণ পাগলের মত শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ায়। শেষেরটাই এখন বেশী ভাবনার। কেননা অভাবের ঘরের বিধবা যুবতীদের অনেকেই শ্মশান ভৈরবী। তাদের একটি যদি বাম গ্রহণ করে?

রাজকুমারী চিন্তার তাড়নায় প্রতিবেশীর বাড়ি গেলেন—সরকার ভাই বামের একটা চাকরী জুটিয়ে দাও।

—বাম কী চাকরী করবে?

—যা তুমি জোগাড় করে দেবে।

রাজাকুমারী সবিশেষ অনুরোধ করে বাড়ি ফিরলেন।

দুর্গাদাস সরকার নাটোর রাজার সেরেস্তায় কাজ করেন তারাপীঠ পরিচালনার ভার তাঁর ওপর। তিনি নায়েবকে বলে বামের চাকরী করে দিলেন। তারামায়ের পুজোর ফুল তোলা বামাচরণের কাজ। যে কাজ বাম আগেও করেছেন সেই কাজ।

সকালবেলা। উল্লাসিত ফুলকাননে প্রবেশ করতেই বামাচরণের মন আনন্দে ভরে গেল। জবাফুলের কী রঙ।

বাম ফুল তোলেন আর গান করেন। গানের তেমন গলা নেই, তবু করেন। গানগুলি মনের আনন্দে গাওয়া তারামায়ের গান।

তারামায়ের পাগল ছেলে বামাচরণের আনন্দের দিন ঝপ করে ফুরিয়ে গেল। ফুলে যেমন অনিষ্টকারী পোকা, সংসারে তেমনি অনিষ্ট-কারী লোক। একজন রাজসরকারে খবর দিল—বামাচরণ কাজ না করে মাইনে পাচ্ছে ভোগ খাচ্ছে।

রাজসরকার থেকে ভরত মৈত্র তদন্ত করতে এলেন। এসে সব দেখলেন সব শুনলেন। আদেশ হল, বামাচরণ মুর্শিদাবাদের কাছারী বাড়িতে রান্না করবে।

—বামকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মুর্শিদাবাদ নিয়ে যেতে পারলেই হয়। মন্দিরের রাখোয়াল ওকে বলল—এই ক্ষ্যাপা, গঙ্গা মাকে দেখবি?

—নাহ্। আমার তারামাই ভাল।

—তারা মাকে তো অনেক দেখলি, দিন কতক গঙ্গা মাকে দেখে আয়।

বামাচরণের মন ঘুরে গেল।

*　　　　*

গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর। বামের শরীর জুড়িয়ে যায়। ছোট ছোট ঢেউ চিক চিক করে। বেলা শেষে জলের রঙ বদলায়। ঘাট নিরালা হয়। উনি একা বসে থাকেন অন্ধকারে।

ধীরে ধীরে বামের অনুভূতি জাগ্রত হয়। তিনি অন্ধকারে সুস্থির বসে থাকেন। তিনি অনুভব করেন অধরা রূপের মাধুরী।

গঙ্গাস্নান করে বাম রাতের রান্নায় মন দিলেন। যে মেয়েটি

কুটনো কুটেছে, বান্না বেঁটেছে, উনুন ধরিয়েছে তাকে বললেন—তুই বেটি ইবার বাড়ি যা।

—আর কিছু লাগবে নাই ঠাকুরমশায়?

—না। আর কিছু লাগবে নাই। তুই বাড়ি যা। তোর ছেলে কাঁদছে, দেখগা।

যুবতী অনিচ্ছায় বাড়ি গেল।

পাচকঠাকুর বামাচরণ উনুনে হাঁড়ি চড়িয়ে ভাত বসিয়ে দিলেন। তারপর কে খবর রাখে? ভাত তলায় ধরে ওপর দিকে উঠছে, বামাচরণ আগের মত অগ্নির রূপ দেখছেন। লেলিহান সপ্তশিখা—কালী, করালী, মনোজবা।···যখন হুঁশ হল ভাতের আর কিছুই নেই।

মৈত্র ধৈর্য ধরে বামাচরণকে সবিশেষ বোঝালেন—কর্তব্য কর্মে অমনোযোগ ভাল নয়। কর্তব্যে অবহেলা অবনতির কারণ।

বামাচরণ মন দিয়ে শুনলেন তারপর মোক্ষম প্রশ্ন করলেন।

—কর্তব্য কী?

যার যা কাজ তাই তার কর্তব্য।

—কাজ একটাই। বামাক্ষ্যাপা রহস্যের হাসি হাসলেন-আমার কাজ হল গিয়ে ঈশ্বরকে জানা। এটাই কাজ আর এটাই কর্তব্য। আর এক কথা। আমার যা কাজ আপনারও তাই। আমাকে ছেড়ে দেন, আমি আমার কাজ করি গা।

মৈত্র ত্বরায় বামাচরণকে মুক্তি দিলেন।

*　　　*　　　*

মায়ের ক্ষ্যাপা ছেলে আবার মায়ের কাছে। রাজকুমারী বামকে আদর করে বললেন—বড় রোগা হয়ে গেছিস রে!

—হব নাই? বামের গলায় অভিমানের সুর বাজে। তুমি আমাকে ইখানে উখানে পাঠাবে আর রোগা হব নাই?

ঠিক আছে বাবা। আমি আর তোকে কুথাও পাঠাবো না।

—সেই ভাল। ইখানে আমার ছোট মা, ইখানে থাকব।

বামাচরণ বড়মায়ের কাছে গেলেন।

বড় মা শিলাময়ী। বিশষ্ঠারাধিতা তারা যত্র তারা শিলাময়ী। পীঠস্থান। বশিষ্ঠ মহাচীনে তন্ত্রাচার শিক্ষা করে এখানে তারা দেবীর আরাধনা করেছিলেন।

দেবী আয়ত চক্ষু, স্ফুরিত নাসা আরক্ত অধরোষ্ঠ রক্তা জিহ্বা হাস্যময়ী। দেবী কাঞ্চনবর্ণা নানা আভরণে সজ্জিতা, মস্তকে রত্নমুকুট। দেবী প্রত্যালীলা পদা ঘোরা মুণ্ডমালা বিভূষিতা। দেবী সৌম্যা সৌম্যতরা অশেষ সৌম্যা। দেবীমূর্তি তন্ত্রোক্ত উপদেশ স্মরণ করে পরিকল্পিত। দ্বিভূজা নাগযজ্ঞেপরী ভিনা। দেবীর বামে শিব স্বরূপ-কম।

বামাচরণ যতই দেখেন ততই তলিয়ে যান। কে যেন অন্তরের গভীরতা থেকে বলল শক্তিকে মাতৃরূপে দেখতে শেখ। শিবকে তাঁর বৎসরূপে।

কী এক আনন্দ বামাচরণের মন ভরে গেল। মন্দির থেকে বেরিয়ে তিনি মনের আনন্দে পথ চলেন আর নামগান করেন! কখনও নিম্নস্বরে কখনও উচ্চৈঃ স্বরে।

দ্বারকার ঘাটে মেয়েরা স্নান করছে। যৌবনসামগ্রী ইচ্ছা করলেই দেখা যায়, বামের সে ইচ্ছা করে না। তিনি যুবক হলেও শিশুর মত উদাসীন। হাউড়ে চেবা আপন ভোলা। তিনি ঘাটে নেমে গা ডেবালেন জলে। তারপর নদী পার হলেন। রোদে বামাচরণের গায়ের ভিজে কাপড় গায়ে শুকোলো।

বাড়িতে রাজকুমারী ভাত আগলে বসে রয়েছেন। চিন্তিত। এতখানি বেলা হল, পাগল ছেলে বাড়ি ফিরল না, চকিতা হরিণীর ন্যায় কান খাড়া করলেন। কে নামগান গাইছে?

বামাচরণ মায়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন।

—মা, আমি তো হাউড়ে। সংসারের কোন কাজই আমার দ্বারা হবে নাই, তবে কেনে সংসারে পড়ে থাকি ?

—তোর যত সব উদ্ভট কথা। নে উঠ। খেয়ে নিবি।

—উঠছি। বাম মায়ের চোখে চোখে রাখল—তুমি যদি অনুমতি দাও, আমি একটু সাধনভাজন করি।

—তা কর না। কে তোকে মানা করেছে ?

—আমি শ্মশানে তন্ত্রসাধনা করব।

—তন্ত্রসাধনা !

মাতা কেঁপে উঠলেন।

* * *

বর্ষা নামতে চায়ের কাজ পড়েছে। রামচন্দ্র জলখাবার নিয়ে মাঠে গেলেন। মুনিষ দুজন বাড়িতে খাবে, সুন্দরী উনুনে কাঠ গুঁজছেন ভিজে-কাঠ ধরতে চায় না, ধোঁয়ায় ঘর ভরে যায়। সুন্দরীর মুখ লাল চোখ দিয়ে জল পড়ে। রাজকুমারী কাঁথা ফেলে উঠে বসলেন —আমি যাচ্ছি।

—থাক তোমাকে আর জ্বর গায়ে হেঁসল ঠেলতে হবে না ! জয়-কালী সুতোকাটা বন্ধ রেখে উঠলেন। তিনি ফুঁ দিতে আগুন জ্বলে।

বামাচরণ সবই দেখলেন। এবং বুঝলেন সুন্দরী এই সংসারে কোন উপকারেই লাগে না। লাগবেও না।

আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা সারাদিন। সন্ধ্যাবেলায় বৃষ্টি নামল। সে বৃষ্টি আর থামেনা। রাত্রে আবার ঝড় উঠল।

বামাচরণের চোখে ঘুম নেই। তিনি তান্ত্রিকের দেওয়া শিমুল ডালটি নেড়ে চেড়ে দেখলেন। নিষ্পত্র সব পাতা ঝরে গেছে। ডালটিও কাঠি, টিপতে মট করে ভেঙ্গে গেল।

বায়ু স্বননেব শব্দে কে যেন ডাকছে—আয় আয় আয়। তিনি

অস্থির পদচারণা আরম্ভ করলেন ঘরের ভেতর। অশনি পাতের শব্দে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। ঝড় বৃষ্টি কমলে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। যে ঘরে মা দিদি ঘুমোচ্ছেন সে ঘরের দরজায় করাঘাত করলেন—মা।

রাজকুমারীদেবী ছেলের ডাক শুনে শয্যায় উঠে বসলেন। ধীর স্থির। তিনি অভয় দেওয়ার মত বললেন—বাম। দাঁড়া, দরজা খুলছি।

মায়ের বিছনায় বসে বামাচরণ বললেন—মা, আমাকে যেমন একবার গর্ভ থেকে মুক্তি দিয়েছিলে তেমনি আর একবার অষ্টপাশ থেকে মুক্তি দাও। এতদিন রাম নাবালক ছিল তাই কিছু বলতে পারি নাই। ইবার বলছি।

বামাচরণ মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বিদ্যুৎ চমকাল। সে আলোয় ছোট মা এমন কিছু ছেলের মুখে দেখলেন যে বড় মা হয়ে গেলেন। বললেন—তোকে মুক্তি দিলাম।

ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক আলো। আবার অন্ধকার। বামচরণ মায়ের মুখ দেখতে পাচ্ছেন না। পেলে দেখতে পেতেন মায়ের চোখে জল।

সাধক বামাচরণ জননীকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোলেন।

মাঠে এক হাঁটু জল, পথ দেখা যায় না। দ্বারকার জলোচ্ছ্বাস শুনে বামাচরণ দিক ঠিক করলেন। বৃক্ষ কোটর থেকে পেঁচা ডাকল পায়ের পাশ দিয়ে সাপ গেল, ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি চলেছেন।

বর্ষায় দ্বারকা এক প্রমত্তা নদী। স্রোতে গাছগাছালি ভেসে যায়। সাধক জয়তারা বলে ঝাঁপ দিলেন। ভেসে গেলেন না। শ্মশান প্রান্তে উঠলেন।

* * *

ভাবুকের কৈলাসপতি যেন কারও অপেক্ষায় বসেছিলেন, বামকে দেখতে পেয়ে বললেন—কে এলি?

বামাচরণ কুঁড়ের ভেতর মাথা নীচু করে ঢুকলেন। সিদ্ধকৌলকে

প্রণাম করলে তিনি একটা কোন দেখালেন হাত তুলে। রাম গাঁজা সেজে কল্কে আর চকমকি পাথর এগিয়ে দিলেন। সিদ্ধকৌল দম দিলেন গাঁজায়। এদিকে রাত একপ্রহর। শেয়াল ডাকল, প্রথমে একটা তারপর একসঙ্গে অনেকগুলো।

সিদ্ধকৌল বললেন—তন্ত্রের পন্থা হল, দেহকে যন্ত্র স্বরূপ করে গুহ্য সাধন।

—সে কেমন সিদ্ধ বাবা ?

—দেহ যন্ত্রে হিন্দু মতে রয়েছে ছয়টি চক্র। বৌদ্ধমতে চারটি সর্বনিম্ন চক্র মূলাধারে, কুলকুণ্ডলিনীশক্তি স্বভাবতঃ নিদ্রিতা। তাকে জাগাতে হবে। এর জন পঞ্চ-মকার গুহ্য সাধনা। মদ্য, মাংস, মৎস্য মৈথুন মুদ্রা এই হল পঞ্চ-মকার। শেষের দুটি জন্য ভৈরবী চাই। তা তোমার আছে ?

—আছে।

—ঘরে ছোট মা, মন্দিরে বড়মা।

—হাউড়ে কোথাকার।

—রাগ কোরো না সিদ্ধ বাবা, মা ছাড়া আমি আর কিছু বুঝিনা; তারা-মা ই আমার ভৈরবী।

—তাহলে শিমুল তলায় গিয়ে তারা মাকে নিয়ে আসন কর।

—ওতেই হবে ?

ভাবুকের কৈলাসপতি মাথা হেলিয়ে দিলেন।

* * *

অমানিশার দ্বিতীয় প্রহর। সাধক বামাচরণ একাগ্রচিত্তে বসলেন পঞ্চমুণ্ডির আসনে উলঙ্গ শরীর, লজ্জা নেই। গলিত শবদেহ পাশে, ঘৃণা নেই। উদ্যত ফণা কালসর্প, ভয় নেই। তাঁর দৃষ্টিতে তারা, শ্রবণে তারা, ঘ্রাণে তারা, স্বাদে, তারা, স্পর্শে তারা, জগৎ তারাময়।

নিমেষে কাল ঝরছে। কাল রাত্রির আরও এক প্রহর কাটল। বাম জানতে পারছেন না। তিনি কী নিদ্রিত ? না কী মৃত ? না।

তিনি কী অচৈতন্য ? না। তিনি ধ্যানস্থ। তাঁর মনে তারা বুদ্ধিতে তারা অহঙ্কারে তারা। তিনি তারাময়।

*   *   *

মায়ের মন। রাজকুমারী ছেলেকে শ্মশানে পাঠিয়ে টিঁকতে পারছেন না। সর্বেশ্বর বামকে দেখে এসে বলল, ভাল আছে। একাই বীরাসনে বসছে।

কিছুদিন রাজকুমারী চুপ করে রইলেন। তারপর আর পার-লেন না। আজ ঠিক করেছেন নিজের চোখে দেখে আসবেন। অমনি তাঁর চোখের মণি নড়ল। শুধু হাতে যাবেন ?

সামনে দুর্গাপূজা। জয়কালী নারকেল নাড়ু করেছেন, গোটা কয়েক মায়ের আঁচলে বেঁধে দিলেন। তাঁর চোখ ছলছল করে। বললেন, মা শীত পড়েছে, আমার কাঁথাটা নিয়ে যাও বামের জন্য।

রাজকুমারী প্রথমে গেলেন মন্দিরে। প্রসাদী ফুল, বেলপাতা নিয়ে নাড়ুর সঙ্গে রাখলেন। তারপর ধরলেন শ্মশানের পথ। এ পথ তাঁর জন্যে নয়। এখানে অস্থি ওখানে করোটি। তাঁর পক্ষে হাঁটাই মুস্কিল। কিন্তু আজ তিনি স্পর্শদোষের কথা ভাবছেন না।

*   *   *

মাকে দেখতে পেয়ে বামাচরণ একপাল কুকুরকে বললেন—এই কালু ভালু, এই জামভোলা, তোরা সর। আমার মা আসছে।

ওরা সুবোধ ছেলের মত পথ ছেড়ে দিল। রাজকুমারী সাধক ছেলেকে বুকে টেনে বললেন—ভাল আছিস বাবা ?

—খুব ভাল। বড়মা আমার সব ভার নিয়েছে। তুমাদের খবর বল।

—আমাদের আর খবর কী ? সুন্দরীর জন্যে বড় ভাবনা হয়।

—কেনে ?

—জানিস না ?

বামাচরণ চুপ করে রইলেন।

সাধক মানুষ ধরা বাঁধার বাইরে।

বামাচরণ কেনই বা শ্মশান থেকে ছুটতে ছুটতে আটলা গেলেন, কেনই বা শম্ভু মোড়লের খড়ের গাদায় আগুন দিলেন, এর কোন ব্যাখ্যা নেই।

অথবা আছে। সাধক জীবন টান দেওয়া রবারের মতন, ছেড়ে দিলেই ছিটকে বেরিয়ে যায়। ভাবের ঘোর কেটে গেলে চৈতন্যদেব অঝোরে কাঁদতেন। রামকৃষ্ণদেব অসংলগ্ন কথা বলতেন। বামদেব আগুন লাগিয়ে নাচছেন।

মোড়ল বললেন—আগুন দিলি কেনে?

—মা যে বললে।

—কী বললে?

—মোড়ল শালার নজর খারাপ। দে উয়ার পালুইয়ে আগুন লাগিয়ে।

গ্রামবাসীজন জানে মোড়লের সুন্দরীর ওপর নজর। তারা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। বামদেব বললেন—মোড়লবাবা, আমার যদি অন্যায় হয়ে থাকে, আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছি।

সকলে বামদেবকে নিরস্ত করলেন। তিনি শ্মশানে ফিরলেন তারা নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে।

* * *

শরতের সকাল। সুনীল আকাশে সাদা মেঘ। বৃষ্টি ধোয়া গাছ গাছালি বড় উজ্জ্বল। কুটির প্রাঙ্গণে ব্রজবাসী কৈলাসপতির মুখোমুখি বসেছেন বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ। শাস্ত্র আলোচনা হতে হতে কালীর ইতিহাস নিয়ে প্রশ্ন উঠল। মোক্ষদানন্দ বললেন—বেদের রাত্রিসূক্তকে অবলম্বন করে দেবী ধারণা গড়ে উঠেছিল। ব্রহ্ম-মায়াত্মিকা রাত্রিঃ পরমেশলয়াত্মিকা। এই দেবী কালিকা নয়, ইনি কৃষ্ণা ভয়ঙ্করী নিঋতি দেবী। শত পথ ব্রাহ্মণে দেবীকে কৃষ্ণা ঘোরা বলা হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে পাশহস্তা। কালীনাম কখন পেলাম?

—মুণ্ডক উপনিষদে কালী নামের উল্লেখ আছে। কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধুম্রবর্ণা।

—ও কিন্তু অগ্নিকে অবলম্বন করে। দেবী হলেও কালী নয়। মাতৃত্বের আভাস নাই।

—হবে। ব্রজবাসী মন্ত্র উচ্চারণের মত বললেন—অগ্নিজিহ্বা, স্ফূলিঙ্গিণী বিশ্বরুচী দেবী।

বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ একটু যেন ভেবে বললেন—মহাভারতের কালী মাতৃরূপা ভীষণা। সৌপ্তিক পর্বে অশ্বত্থমা যখন পাণ্ডব শিবিরে নিদ্রিতদের হত্যা করেছিলেন, তখন তিনি কালীকে দেখতে পান। রক্তাস্যনয়না, পাশহস্তা ভয়ঙ্করী।

—দেবী কালীরূপে শুধুই ভীষণা?

—না। বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ মৃদুস্বরে বললেন—মাতৃত্বের আভাস রয়েছে। ব্রজবাসী কৈলাসপতি মুখ ঘোরাতে দেখলন শিমূল গাছতলায় বামাচরণ চুপচাপ বসে। তিনি ডাকলেন—ক্ষ্যাপা।

—যাই গুরুবাবা। বামাচরণ উঠলেন।

জঙ্গলে পাখির ডাক ছাড়া শব্দ নেই। মোক্ষদানন্দ কলধ্বনি শুনতে শুনতে ব্রজবাসীকে বললেন—রাজা গোঁসই কী দীক্ষা দিয়েছেন বামকে?

—না। বাম ভৈরবী জোটাতে না পারায় তিনি আর উৎসাহ পান নাই। আপনি বামকে কিছুদিন বেদ পাঠ করে শোনান, পরে শুভদিন দেখে দীক্ষা অভিষেকের ব্যবস্থা করব।

—কিন্তু বীজমন্ত্র দেবেন আপনি।

—তাই হবে। ব্রজবাসী উঠে দাঁড়াতে বেদজ্ঞও উঠলেন। একবার মন্দির ঘুরে আসবেন তাঁরা। কিছু ভক্ত অপেক্ষা করছেন ওখানে। বামাচরণ ভক্তিভরে উভয়কে প্রণাম করলে ব্রজবাসী বললেন —কাল থেকে মোক্ষদানন্দের কাছে যাবি।

মোক্ষদানন্দ বেদ পড়ে শোনাতে আরম্ভ করলেন। বামাচরণ খুব

মন দিয়ে শোনেন ব্যাখ্যা। কোন কথা অবিশ্বাস করেন না। ধীরে ধীরে তাঁর জ্ঞান বাড়ল। এমনই এ জ্ঞান যে তথ্যের অন্তর্গত তত্ত্ব সহজেই ধরা পড়ে। তিনি ত্বরায় উপলব্ধি করলেন যে, বিশ্বের মূলে অদ্বিতীয়া সনাতনী শক্তি, এবং দেশে কালে অনন্ত বৈচিত্র্য সেই শক্তির প্রকাশ মাত্র।

মোক্ষদানন্দ বেদপুরাণে সুপণ্ডিত। তিনি অথর্ব বেদের পৃথিবী-সূত্র ব্যাখ্যা করলেন। তারপর পদ্মপুরাণ থেকে পড়ে শোনাচ্ছেন—সর্বগা সর্বভূতেষু দ্রষ্টব্যা সর্বতঃ অদ্ভুতা। সদসচ্চৈব যৎকিঞ্চিৎ দৃশ্যং তৎ ন বিনা ত্বয়া।

বামদেব বুঝলেন। সর্বভূতে তুমি। সৎ অসৎ যা কিছু দেখা যায় তুমি বিনা নয়।

* * *

কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি। আগামীকাল বামাচরণের অভিষেক। আজ তিনি দীক্ষান্তে ভিক্ষায় বেরোলেন। আটলা গ্রামে যা পেলেন তাতে পঞ্চাশ জন খাওয়ানো যেতে পারে। সুতরাং তিনি দূরান্তরে না গিয়ে ছোটমায়ের কাছে বসলেন। এমন শীতল স্থান তো আর নেই।

রাজকুমারীর এই ছেলেটি অগৃহী। তাঁর কোন কাজেই লাগে না। তবু তিনি তার জন্যে ভেবে মরেন। এখন পরম স্নেহে গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। মনে মনে বললেন, তারার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। বাম প্রণাম করলে তিনি প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করলেন—আনন্দে থাক বাবা, আনন্দে থাক।

কৃষ্ণা চতুর্দশী। সকালবেলা বামাচরণ খিচুড়ি ভোগ রাঁধলেন। মাকে নিবেদনের পর অভ্যাগতদের পরিবেশন করলেন। দুপুরে পূজা ও হোম। বামদেবের অভিষেক শেষ হতে দিনমণি অস্ত গেল।

সন্ধ্যায় আরতি। বামাচরণ নির্ণিমেষ তাকিয়ে আছেন দেবীমূর্তির দিকে। অট্টহাস্যময়ী শঙ্খমালা বিভূষিতা, দক্ষিণ হস্তে খর্পর বামহস্তে

কপালপাত্র, বামপদ সম্মুখে প্রসারিত। কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে আরতি শেষ হল। তিনি প্রণাম করে শ্মশানে চললেন।

অমানিশা। শিবাগণ প্রথম প্রহর ঘোষণা করেছে। ব্রজবাসী কৈলাসপতি সিদ্ধকৌল দীক্ষিত শিষ্য বামাচরণকে কুটিরে প্রবেশ করতে বললেন। তিনি প্রবেশ করলেন। কুটির অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। বামাচরণ অনুমানে আসন ঠিক করে বসলেন। সিদ্ধকৌল বামাচরণকে একাগ্র হতে আদেশ করলেন। তিনি একাগ্র হলেন। কুটির অভ্যন্তরে আলোক কণিকা ইতস্ততঃ বিচরণ করে আবার একত্র হয়ে অক্ষরও সৃষ্টি করে। সিদ্ধকৌল বামাচরণকে বীজমন্ত্র দর্শন করতে আদেশ করলেন। তিনি বীজমন্ত্র দর্শন করলেন।

[তিন]

আঠারশো উনসত্তর খ্রীষ্টাব্দ। লর্ড মেয়ো ভারতের বড়লাট। বিগত কয়েক বছর অন্নের অভাবে মানুষজন হাজারে হাজারে মরেছে। এখনও মরছে। দেশে জলসেচের তেমন ব্যবস্থা নেই। বৃষ্টি না হলেই আকাল। উড়িষ্যায় আকালে দশ লাখ লোক মরেছে। বীরভূমেও বড় আকাল।

তন্ত্রসাধক বামদেবের অসহ্য যন্ত্রণা হয়। তিনি তিষ্ঠোতে পারেন না। প্রাণ বুঝি যায়। সিদ্ধকৌল বললেন—মৃত্যুকে দেখি বড় ভয়। প্রতিদিন এত মানুষ মরছে তবু? ক্লীবত্ব পরিহার কর।

বত্রিশ বছরের সাধক মনে বীরভাব আনলেন। ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শোকঃ জুগুপ্সা চাইতি পঞ্চমী। অচিরে তিনি ভয়পাশ মুক্ত হলেন।

রজনী প্রভাত হল। শ্মশানে মড়া এল, চিতা জ্বলল। বামদেব উদাসীনবৎ আসীন।

*   *   *

ব্রজবাসীর এবং বেদজ্ঞ'র কাজ শেষ। তাঁরা মনস্থ করেছেন কাশী

যাবেন। কাকভোরে রেলস্টেশনের পথ ধরবেন, বামদেব উপস্থিত।

বালক স্বভাব সাধক নাছোড়বান্দা। তিনি গুরুবাবাদের সঙ্গে যাবেনই। অগত্যা ওঁরা বামদেবকে সঙ্গে নিলেন। খুশীমনে বাম তারামাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—কাশী ঘুরে আসি, কেমন?

বলেই কেমন যেন গম্ভীর। মনের ভেতর কে যেন মানা করল। বামদেব কাঁদতে লাগলেন তখন আবার মনের ভেতর কে যেন সায় দিল। এর ব্যাখ্যা কী? পাগলই তো আপন মনে আলাপ করে। বামদেব পাগল হলেন নাকি?

তাই। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, বামদেব মায়ের নামে পাগল। লোকে বামদেবকে তো বামাক্ষ্যাপাই বলে।

বেদজ্ঞ হেসে বললেন—ক্ষ্যাপা, কাশী যাচ্ছিস্, তারামায়ের জন্যে মন কেমন করবে না?

—তা আবার করবে না? তবে কী জানেন গুরুবাবারা। বামদেব রহস্যের হাসি হাসলেন—না দেখলে থাকতে নারি, দেখলে চুলোচুলি করি?

—সে কী রে?

বামদেব গান ধরলেন—'আয় মা সাধন সমরে, দেখি মা হারে কী ছেলে হারে।...'

টিকিট কিনে তিনজন প্ল্যাটফরমে দাঁড়ালেন। ধোঁয়া উড়িয়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেন এল। বামদেব অবাকচোখে ইঞ্জিন দেখছেন—কলের গাড়ী কে করেছে গো?

—সাহেবরা। মোক্ষদানন্দ উত্তর দিলেন।

—সাহেব বাবারা তো খুব বুজরুগ আছে।

বলে বামদেব গার্ড সাহেবকে কৌতূহলের চোখে দেখছেন। সাহেব বাঁশী বাজাল, পতাকা নাড়ল। সিদ্ধকৌল তাড়া দিলেন—ক্ষ্যাপা ওঠ; গাড়ী ছেড়ে দেবে।

ক্ষ্যাপা উঠবেন কী, ফিরিঙ্গী যুবতী দেখে স্থাণু। ভাবছেন এ কোন এলোকেশী মেয়ে, দেখলে মা বলে মনে হয় না। মোক্ষদানন্দ বামদেবকে টেনে তুললেন কামরায়। হুসহাস শব্দে গাড়ী ছাড়ল। তিনি গান ধরলেন—'মা হওয়া কী সহজ কথা।...'

মা হওয়া সহজ কথা নয়। তাই মা হতে চায় না কোন কোন নারী। তারা অনুপ্রাণিত মেনকা উর্বশীর আদর্শে। বেশবাসে ঝলমলে হয়ে পুরুষের গলা জড়িয়ে ধরে। এমন নারীও সাধকের জীবনে আসে।

*   *   *

কাশীধামে লোকারণ্য। তারাপীঠে যেমন গাছগাছালি, এখানে তেমনি নরনারী। ঘন সন্নিবিষ্ট। গাছগাছালি সরিয়ে তবু হাঁটা যায় কিন্তু মানুষজন সরিয়ে হাঁটা শিবের অসাধ্যি।

দমবন্ধ হবার উপক্রম বামদেবের। বললেন—গুরুবাবারা, এ কোথায় নিয়ে এলেন। এখানে থাকলে আমি মরে যাব।

—মরবি না। তবে কষ্ট পাবি।

—কষ্ট বলে কষ্ট। খাওয়ার শোয়ার এমনকি হাগা মুতের কষ্টের অবধি নাই।

অর্দ্ধভুক্ত বামদেব ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছেন। এক দয়াবতী নারী বালিকস্বভাব বামদেবের শুকনো মুখ দেখে স্থির থাকতে পারলেন না। গাঁটের পয়সা খরচ করে পুরি তরকারী আর মেঠাই কিনে তাঁকে ঘুম থেকে ওঠালেন। সুপ্তোত্থিত বামদেব অবাক। বললেন—মা মাগো ক্ষ্যাপাছেলের ওপর এত টান।

—হবেই তো। মায়ের ছেলের ওপর টান না হলে সৃষ্টি রক্ষা হয় কী করে ?

—ঠিক, ঠিক বলেছ তুমি। বামদেব খেতে বসলেন, যেন নিজের মায়ের সামনে। মেঠাই খাওয়ার পর বললেন—মা, জল খাব।

দয়াবতী লোটাভর্তি জল নিয়ে এলেন।

সংসারে দয়াবতী নারী না থাকলে অনেক সাধকই ক্ষুধাতৃষ্ণায় কষ্ট পেতেন। কে জানে, সুজাতা গৌতম বুদ্ধকে পায়েস না খাওয়ালে তিনি হয়ত মারাই যেতেন। নারী যখন ঘরে কল্যাণী তখন গৃহস্থের কল্যাণ আর যখন বাইরে কল্যাণী তখন সাধকের কল্যাণ।

বামদেব কাশী দেখতে বেরিয়েছেন।

মণিকর্নিকার ঘাট। এখানে সতীর কান পড়েছিল। একান্ন পীঠের এক পীঠস্থান। বামদেব এলে ত্রৈলঙ্গস্বামী তাঁকে গভীর আলিঙ্গন করলেন। এ এক অপূর্ব দৃশ্য। বিরাটকায় হাস্যবদন দুই উলঙ্গ শিশু, পুরুষাঙ্গ নিমিত্তমাত্র। যৌনচেতনা না থাকায় লিঙ্গ বড় হয় না সাধকদের।

উপস্থিত জনতা জয়ধ্বনি দিল। জয় বালকবাবাদের জয়।

বাবারা হরিশ্চন্দ্রের মহাশ্মশানে আসন নিলেন। তর্ক বিচার বা আলোচনায় গেলেন না। হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে শুধু অনুভব।

সম্মুখে জননী জাহ্নবী বয়ে যায়।

* * *

কাশীতে একমাস কাটল। নিত্য নূতন সাধুসঙ্গ। আজ কৈলাসপতি ও মোক্ষদানন্দ হরিদ্বার গেলেন, বাম গেলেন না। তাঁর আর প্রবাস ভাল লাগছে না, তিনি তারাপীঠ ফিরবেন। রেলগাড়ীর কামরায় বসে ভাবছেন। তারাপীঠের শ্মশানই আমার ভাল। শিমুলতলায় বসলে শরীর জুড়িয়ে যায়। আর এই কাশী? গঙ্গার ঘাট, বিশ্বেশ্বরের মন্দির, সব যেন হাট বাজার। মানুষ গিজ গিজ করে।

বামদেব সিউড়ি স্টেশনে নেমে কালীবাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। এখানে দেবী বিচিত্র খট্বাঙ্গধরা নরমুণ্ডমালা বিভূষণা, দ্বীপিচর্মপরিধানা শুষ্কমমাংসাতিভৈরবা। অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা, নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিত দিঙ্‌মুখা। তিনি দেবী মহামায়াকে প্রণাম করে মন্দিরে চুপ করে বসলেন।

সেবাইতের মা অনুপমা দেবী মন্দিরে পুজো দিতে এসে বামদেবকে

দেখে বাক্যহারা। কে এই বিশালকায় পুরুষ?

পুরবাসীজন বলতে পারে না। তখন অনুপমা কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে বাবা?

—আমি? আমি মায়ের পাগল ছেলে। তারাপীঠে থাকি।

অনুপমা বুঝলেন, লোকটি সাধক। কী করে বুঝলেন?

বোঝা যায়। আকারৈঃ ইঙ্গিতৈঃ গত্যা, চেষ্টয়া ভাষণেন চ, নেত্রবক্ত্র বিকারৈঃ চ লক্ষ্যতে অন্তর্গত মনম্। বামদেবের উদাসীন আকার সহজ ইঙ্গিত সরল গতি স্বচ্ছ ভাষা এবং চোখমুখের বিকার দেখে অনুপমা বুঝলেন। এবং তাঁর মনে সেবার আগ্রহ এল।

অনুপমা দেবী ত্বরায় বামদেবের স্নান ও আহারের ব্যবস্থা করলেন। তারপর বিশ্রামের তিনি সব কিছু নিজের হাতে করলেন। এত সেবা সেবাইতের মা আর কাউকে করেন নি।

সন্ধ্যারতির পর বামদেব দেবী মহামায়া সম্মুখে ধ্যানস্থ হলেন। নিশ্চল দেহ অপলক দৃষ্টি, প্রাণ ও অপান বায়ু ধীরগতি।

ত্রিযামা অতিবাহিত হলে বামদেব আসন পরিত্যাগ করলেন। বদনমণ্ডল প্রভাত সূর্যের ন্যায় ভাস্বর।

অনুপমা কৃতাঞ্জলি পুটে বললেন—বাবা, আশীর্বাদ করুন।

—আশীর্বাদ করি, তোমার চৈতন্যের বিকাশ হোক। বামদেব তারাপীঠের পথ ধরলেন।

* * *

সিউড়ি থেকে তারাপীঠ দীর্ঘ পথ।

সূর্যের উদয়াস্ত হেঁটেও পথ ফুরোয় না। বামদেব পথের ধারে বিগ্রহহীন জীর্ণমন্দিরের চত্বরে বসে আওয়াজ দিলেন—জয়তারা।

নাদধ্বনি বায়ুমণ্ডলে কম্পন সৃষ্টি করল এবং শব্দতরঙ্গ বৃত্তকারে পরিব্যাপ্ত হল। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রতিধ্বনি বলল—জয়তারা।

বামদেব যতবার জয়ধ্বনি করেন, প্রতিধ্বনিও ততবার করে। সহসা তিনি বিস্মিত হলেন।

শব্দের অতীত অক্ষর। অক্ষরের অতীত নাদাত্মকং জগৎ। তন্ত্রে আছে, নাদ মূলাধারে পরা, স্বাধিষ্ঠানে পশ্যন্তি, হৃদয়ে মধ্যমা এবং মুখে বৈখরী। পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা, বৈখরী এগুলি নাদের যথাক্রমে উদিত অব্যক্ত, প্রবক্ত এবং প্রকাশিত অবস্থা। নাদ-সাধনা এক দুরূহ সাধনা।

নাদসাধক বামদেব বিস্মিত হয়েছেন প্রতিধ্বনির অতীত নাদধ্বনির উপলব্ধিতে। কী অসীম শক্তি নাদধ্বনির। প্রলয় ঘটাতে পারে। এই চিন্তায় তিনি ধ্যানস্থ হলেন। যখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল তিনি হাসলেন। সাধকের হাসি বড় রহস্যময়।

সন্ধ্যা নামছে ধীরে। নীড়ে ফেরা পাখির কাকলী আর শোনা যায় না। কী এক মৌনতা পথে প্রান্তরে। পথিক বামদেব গান ধরলেন—'মায়ের গুপ্তভাবে আপ্তলীলা, সগুণে নির্গুণে লুকোচুরি খেলা।...'

গাইতে গাইতে হাঁটছেন। আর পথ বেশী বাকী নেই। তারা-মায়ের মন্দির দেখতে পেয়ে বামদেব হাত বাড়িয়ে দিলেন—আর পারি না। মা, এইবার হাত ধরে নিয়ে চল।

নির্জন পথ। বামদেবকে দেখার লোক নেই। থাকলে দেখতে পেত অসাধারণ এক দৃশ্য। শিশু যেমন মায়ের হাত ধরে হাঁটে, তেমনি তিনি হাঁটছেন। একটি হাত মুঠকরা। এমনই আবিষ্টভাব সাধকের।

*　　　*　　　*

ক্ষুধার্ত বামদেবের তর সয় না। তারা দেবীকে ভোগ নিবেদন করার আগেই ফল মিষ্টি খেতে আরম্ভ করলেন। কোনদিকে দৃষ্টি নেই।

পুরোহিত খর চোখে তাকালেন—একী হচ্ছে ?

—কী আবার হবে। মা খেতে বলল, খাচ্ছি।

—বটে। পুরোহিত মায়ের পাগলছেলেকে খুব পিটোলেন। পিঠের চামড়া ফেটে রক্ত পড়ে। বামদেব কাঁদতে কাঁদতে তারা মাকে বললেন—তুই আমাকে মার খাওয়ালি।

কথিত হল, তারা মা বামাক্ষ্যাপার রক্তাক্তপিঠ দেখে তাঁকে বলেছেন, ওরা তোকে মারেনি আমাকে মেরেছে। এই দ্যাখ আমার পিঠে রক্ত। তোর খাওয়া হল না? ঠিক আছে আমিও খাব না।

এর ব্যাখ্যা কী?

মাতৃসাধক বামদেবের চেতনা এমনই উদ্বুদ্ধ যে তিনি অপ্রত্যক্ষ রূপ প্রত্যক্ষ করেন অশ্রুত শব্দ শ্রবণ করেন অনাঘ্রাত গন্ধ জিঘ্রণ করেন অনাস্বাদরসের স্বাদ গ্রহণ করেন এবং অস্পর্শনীয় বস্তু স্পর্শ করেন। সাধক একাগ্রচিত্ত সংযমে ইন্দ্রিয়াতীত ক্ষমতা (অতীন্দ্রিয় অনুভূতি) অর্জন করতে সক্ষম। যেমন, শিল্পীরা।

অতীন্দ্রিয় অনুভূতির বলে চিত্রশিল্পী অপ্রত্যক্ষ রূপ দর্শন করেন এবং সুরশিল্পী অশ্রুত শ্রুতি শ্রবণ করেন। মনে হতে পারে, যা নেই তা দেখা, যা নেই তা শোনা অসম্ভব।

কিন্তু নেই কেন? মেঘে আকুল কুন্তলা নেই কিন্তু তার রূপের আভাস আছে। চিত্রশিল্পী সেই রূপ দেখতে পান। রাগ রাগিনীতে ভৈরবী পূরবী উচ্চারিত নেই কিন্তু সুরের আরোহণে অবরোহণে তার আভাস আছে। তাই সুরশিল্পী ভৈরবী পূরবী বুঝতে পারেন!

আরও এক কথা। চিত্রশিল্পী বর্ণের অন্তর্গত বর্ণাভাষ (টোন) দেখতে পান। সুরশিল্পী সুরের অন্তর্গত শ্রুতি (একাধিক) শুনতে পান। রূপ সাধনা অথবা সুর সাধনার থেকে দুরূহ এক সাধনা হল চৈতন্য সাধনা, রঙ তুলি বা তানপুরা বেহালার মত অবলম্বন নেই। শুধু চেতনা। চৈতন্য সাধক বামদেব চৈতন্যময়ী তারা মাকে আকুল হৃদয়ে বললেন—মাগো, আমাকে নিয়ে তোর হয়েছে এক জ্বালা।

দেবী মধুর হাসলেন। শুধু তাঁর জন্য।

*　　*　　*

মন বড় বালাই। তাকে নিয়ে পারা যায় না। কেবলই বিচলিত হয়।

নাটোরের রাণীমার সহসা কী কথা মনে পড়ল। কথাটার নাগাল

কিন্তু তিনি পাচ্ছেন না শুধু মন কেমন করে আর চোখ জলে ভেসে যায়। রাণীমা নায়েবকে বললেন—আমার কলকাতা ভাল লাগছে না। আমি তারাপীঠ যাব।

—কবে রাণীমা?

—আজ। এখনই।

রাণীমা যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হলেন। সুতরাং পাল্কী বেহারা এল, দাসদাসী তল্পি বাঁধল, নায়েব তহবিল থেকে টাকাকড়ি নিলেন।

ছয় বেহারা রাণীর পালকি নিয়ে চলেছে। ডুলকি চালে পালকি দোলে। রাণীমার মন পাখা মেলল। তিনি মনে মনে উড়ে চললেন।

তারা মন্দিরে ব্যস্ততা। রাণীমা পুজো দিচ্ছেন। রাশি রাশি ফুল বেলপাতা থরে থরে ভোগ নৈবেদ্য। পুরোহিতের পাশে তিনি উদাসিনী প্রায় বসে আছেন। সহসা মনে পড়ল বামকে। নায়েবকে বললেন—সেই লোকটি কোথায়?

—কোন লোকটি রাণীমা?

—সেই যিনি মায়ের পুজোর ফুল তুলতেন······সেই যিনি মুর্শিদাবাদের কাছাড়ি বাড়িতে রান্নাবান্না করতেন···

—বুঝেছি। আপনি বামাক্ষ্যাপার কথা বলছেন।

—তাঁকে একবার ডাকুন।

বামদেব শ্মশান থেকে মন্দিরে এলেন। বিপর্যস্ত শরীর কিন্তু মনের বিকার নেই। প্রসন্নদৃষ্টি হাস্যবদন।

রাণীমা পিঠ দেখে চমকে উঠলেন—একী!

—ই কিছু না। নিবেদনের আগে ভোগ খেয়েছিলাম, তাই মা মেরেছে।

—মা মেরেছে? রাণীমা বিস্ময়ের চোখে পুজারীর দিকে তাকালেন।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে পূজারী বললেন—দারোয়ান বেটা বড় বেশী পিটিয়েছে ক্ষ্যাপাকে।

এই কথায় রাণীমা ক্রুদ্ধ হলেন। কোপেন অস্যা বদনং মসীবর্ণং অভূৎ। ভ্রূকুটী কুটিল তস্যা ললাট-ফলকং। তিনি দেবীর ন্যায় বজ্র-কণ্ঠে আদেশ করলেন—এই অসুরদের দূর করে দাও।

রাজকর্মচারীগণ পূজারী ও দ্বারপালকে মন্দির প্রাঙ্গণ হতে বহিষ্কার করলেন।

রাণীমা শান্ত হলে তাঁর মুখমণ্ডল গৌরবর্ণ এবং ভ্রূকুটি কুটিল ললাট মসৃণ হল। তিনি বামদেবকে বললেন—আমার মন বলছিল, কোথায় কিছু অন্যায় হয়েছে···বিহিত তো করলাম···অপরাধ নিও না বাবা।

বাম বললেন—মায়ের আবার অপরাধ কী? মায়ের অপরাধ হয় না। যে স্নেহ করে সে শাসনও করে।

বলে শ্মশানে গেলেন।

কলকাতা ফিরবার সময় হয়েছে। রাণীমা আবার উতলা। কী যেন করার বাকী রয়েছে। সহসা তাঁর মনে পড়ল। তিনি বামকে মন্দিরের সমস্ত ভার দেবার আদেশ দিয়ে গেলেন।

[চার]

আঠারশো অষ্টআশি সাল। ল্যান্সডাউন এখন বড়লাট। ইংরেজ শাসনে বাংলার শহর গড়ছে গ্রাম ভাঙ্গছে। তারাপীঠ ঘিরে যে ক'খানা গ্রাম সব হত দরিদ্র। মিশনারীরা বুভুক্ষুকে খেতে দিয়ে বলছে—খ্রীষ্টের ভজনা কর।

তবু মিশনারীদের ফিরে যেতে হচ্ছে। গ্রামবাসীজন শত দুঃখেও দেবদ্বিজে বিশ্বাসী। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম ভয়াবহঃ।

পূজারী বামদেব সনাতন ধর্মের মাথা দশহাত উঁচু করে দিলেন।

দক্ষিণে রামা বামে বামা। শিক্ষিত যুক্তিবাদী পুরবাসীজন আসছেন কলকাতা হুগলী সিউড়ি বর্ধমান থেকে। তারা মায়ের পুজো দেখতে।

পুজারী বামদেবের পূজাপদ্ধতি শিশুসুলভ। ন্যাস শুদ্ধি আচমন কিছুই নেই। তিনি দেবীকে আর দেবী দেখেন না। বড়মা এখন ছোট মা। তিনি দেবীকে বললেন—মা, তুমি ফুল নাও। মা, তুমি ফল খাও।

এবং তিনি আকুল হৃদয়ে দেবীকে মা বলে ডাকেন। সে কী ডাক, শুনলে অভক্তের ভক্তি অবিশ্বাসীর বিশ্বাস আসে। তার প্রত্যয় যায়, দেবতা আছে, দেবতার কৃপা আছে।

রাত্রে বামদেব তারা নাম জপ করেন এবং তাঁর ভাব সমাধি হয়। সে সমাধি ভাঙ্গে পরদিন সকালে।

সমাধি কী করে হয়?

মানুষের বৃহৎমস্তিষ্ক ক্ষুদ্রমস্তিষ্ক, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হৃৎপিণ্ড ফুস-ফুস, পাকস্থলী, রক্তকোষ গ্রন্থি ইত্যাদি স্থূল অংশগুলি পরীক্ষা করে বিজ্ঞানী দেহের মোটামুটি নাগাল পেয়েছেন। কিন্তু মন? মানুষের মন বলে আর একটা জিনিষ আছে। তার অতি সামান্য নাগাল পেয়েছেন বিজ্ঞানী কারণ মনের অংশগুলি দেহের অংশের মত স্থূল নয়।

শাস্ত্র বলে, মন এক সূক্ষ্ম ব্যাপার। মনের এক অংশ প্রাণ আর এক অংশ চৈতন্য। প্রাণের স্পন্দন-শক্তি হৃৎপিণ্ড ফুসফুস পাকস্থলী ইত্যাদি যন্ত্রগুলিকে সচল রাখে। ফলেই জীবন। জীবিত মানুষ চৈতন্য-সাধনায় সক্রিয় হলে সঙ্কল্প, সংশয়-নিশ্চয়, অনুসন্ধান এবং অভি-মান বৃত্তির স্ফুরণ ঘটে। পরের ঘটনা জ্ঞান লাভ। আত্মজ্ঞান লাভে সমাধি।

*   *   *

বামদেবের পক্ষে পুজারীর কর্তব্য কর্ম করা সম্ভব নয়। তিনি উচ্চমার্গের সাধক। কিন্তু মাসিক বৃত্তি?

বিদ্যারূপিণী নারী সাধকের সহায়। রাণী ব্যবস্থা করলেন। বামদেব যেমন মন্দিরের প্রধান আছেন তেমনি থাকবেন, বৃত্তিও অটুট থাকবে। দুজন উপ-পূজারী নিত্যকর্ম করবেন। দেবীর ভোগের আগে বামদেবের ভোগ হবে।

যথা আজ্ঞা তথা কাজ।

সাধক বামদেব স্বাধীন চিত্তে যত্রতত্র বিচরণ করেন। অবারিত মাঠে ঘাসের ওপর শুয়ে থাকেন। অন্নদায়িণী ধরিত্রী মাতার কোল ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করে না। বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দের কথা মনে পড়ে। মাতা পৃথিবী মহীয়ং। অমানিশায় শ্মশানের শিমুলতলায় স্থির বসে থাকেন। রাত্রি দেবীর রূপ দেখে আশা মেটে না। আবার মোক্ষদা-নন্দের কথা মনে পড়ে। ব্রহ্মমায়াত্মিকা রাত্রিঃ।

নদীও পৃথিবী বা রাত্রির মত মাতা। ত্রিতাপহারিণী। মায়ের মত টান। মায়ের মত শীতল কোল।

বামদেব সারাবেলা দ্বারকা নদীর জলে ভাসছেন। শীতল জলে শরীর জুড়িয়ে যায়। সহসা গর্ভধারিণী মাকে মনে পড়ল। তিনি সাঁতরে ওপাড়ে উঠলেন এবং কাল বিলম্ব না করে বাড়ি পৌঁছলেন। রান্নাঘরে খুঁজছেন মাকে, রামচন্দ্র বললেন—মা নাই।

সাধক বামদেব শিশুর মত কিছুক্ষণ কাঁদলেন। বুকটা হালকা হল, শোকের বেগটা তেমন আর নেই। এখন কর্তব্যের কথা মনে পড়েছে। ভাইকে বললেন—মায়ের পারত্রিক কাজ করতে হয়।

—হ্যাঁ। রামচন্দ্র মুখটা করুণ করল—কিন্তু দাদা শ্মশান ওপাড়ে।

—জানি। বামদেব মায়ের শব পিঠে বেঁধে দ্বারকার দিকে চলেছেন। পিছনে রামচন্দ্র ও জয়কালী।

বামাচরণ বক্ষ প্রসারিত করে বেগবতী নদীতে ঝাঁপ দিলেন। রাম-চন্দ্র এবং জয়কালী ভয়ার্ত। এই স্রোতে গুরুভার পিঠে নিয়ে কেউ ওপাড়ে যেতেপারে ?

পঞ্চাশে পা দিলেও বামদেব পারেন। তিনি অবলীলাক্রমে নদী

পেরিয়ে উঠে এলেন এপাড়ে। তারপর বড়মার আঙ্গিনায় ছোট মাকে শুইয়ে দিলেন।

চিন্তা প্রজ্জ্বলিত হল। সুলোহিতা সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিণী, বিশ্বরুচি, লোলায়মানা, সপ্তজিহ্বা অগ্নি রাজকুমারীর দেহ গ্রহণ করলেন। দাহান্তে নাড়ি-কুণ্ডলী বামদেব বিসর্জন দিলেন দ্বারকায়।

*　　　*　　　*

মাতার আদ্যশ্রাদ্ধে বামদেব পরিচিত অপরিচিত সকলকে নিমন্ত্রণ করলেন। সুতরাং ভোজ খেতে কয়েকশত নরনারী উপস্থিত। ভীত রামচন্দ্র মুখ লুকিয়ে আছেন। আহার্যের তেমন আয়োজন কোথায়?

ভাইয়ের মনোভাব বুঝতে পেরে বামদেব বললেন—ভয় নাই। আশ্চর্য। কিছুক্ষণ পরেই পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘি, ময়দা, চিনি, ছানা নিয়ে উপস্থিত বামাচরণের ভক্ত মণ্ডলী। এমন আয়োজন আটলায় কদাচিৎ হয়েছে। এবার ময়দা মাখো ভিয়েন চড়াও। লুচি মিষ্টি হোক।

প্রশস্ত মাঠে দরিদ্র গ্রামবাসীজন খেতে বসেছে, ঝড় উঠল। বুঝি সব বরবাদ হয়। বামদেব আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন কিন্তু ভয় পেলেন না। হুঙ্কার দিয়ে বললেন—এই আমি গণ্ডি দিয়ে দিচ্ছি। এর মধ্যে বৃষ্টি পড়বে না।

সত্যিই গণ্ডির মধ্যে বৃষ্টি পড়ল না।

এর ব্যাখ্যা কী?

বিজ্ঞানে এর ব্যাখ্যা নেই। তবে কিছু কিছু অলৌকিক ব্যাপার ঘটে। আটলা গ্রামের মানুষজন বড়ই সরল। সাধক বামদেব অলৌকিক শক্তি বলে প্রাকৃতিক ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করেছেন বিশ্বাস করতে কারও মাথা কাটা গেল না।

দু'চার জন শিক্ষিত মানুষ ভাবলেন, ব্যাপারটা প্রাকৃতিক ঘটনা। শরতের মেঘ যেখানে দাঁড়ায় সেখানেই বৃষ্টি। ওখানে দাঁড়ায় নাই তাই হয় নাই। তাঁদেরও কিন্তু মন খুঁত খুঁত করে। তাঁরা মুখ খুললেন না। কে জানে, প্রাকৃতিক না অপ্রাকৃতিক ঘটনা।

নিমন্ত্রিত জনগণ পেট ভরে লুচি মিষ্টি খেয়ে পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুললেন। তাঁরা বামদেবের নামে জয়ধ্বনি দিলেন। আর তাঁরা বলে গেলেন—বামদেব সিদ্ধপুরুষ। বৃষ্টি স্তম্ভণে অধিকারী।

*　　　　*　　　　*

সাধক বামদেবের মেজাজ অতিশয় উগ্র। কেউ তাঁর কাছে যেতে পারছে না। তিনি একাকী মন্দিরে বাস করছেন। বিশাল শরীর যেন বিদ্যুৎগর্ভ জলধর। তিনি সঙ্কল্প করেছেন, অশনি পতন ঘটাবেন আজ রাতে। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

মানুষজন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে। সারাদিন কাটল কিছুই হল না। সন্ধ্যারতির পর যে যার ঘরে ফিরল। শঙ্কিত চিত্ত, কারণ তারা অবিশ্বাসী নয়। কায়ামনপ্রাণে বিশ্বাস করে, সাধকের সঙ্কল্প মিথ্যা হয় না।

শুক্লা চতুর্দশীর রাত। আকাশে মেঘ নেই চাঁদের আলোয় ধরাতল ভেসে যায়। সাধক বামদেবের সমাধি ভঙ্গ হল। তিনি নাদধ্বনিতে বায়ুলোক কাঁপিয়ে তুললেন। চরাচর স্তব্ধ। কুলায়ে ভীত পক্ষীকুল ডানা ঝাপটায়, শ্মশানে সচকিত শিবাদল করুণস্বরে ডাকে। সহসা তীক্ষ্ণ শব্দে অশনি পাত হল।

গ্রামবাসীজন দেখল, মন্দিরের চূড়ায় দীর্ঘ ফাটল এবং মন্দিরের প্রাঙ্গণে বামদেব নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির।

আবার এক ঘটনা।

মধ্যাহ্ন বেলা। বামদেব শ্মশানভূমি থেকে বেগে মন্দিরে এলেন। ভক্তজনদের দিকে ফিরেও দেখলেন না। সটান মন্দিরে প্রবেশ করলেন। ভক্তজন রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে। এক এক পল যেন এক এক প্রহর। উদ্বেগের সময় ধীরে কাটে।

সহসা ভক্তজন চাপড় মারার কঠিন শব্দ শুনলেন। কী হল? সাহসে ভর করে কতিপয় ভক্ত উঁকি মারলেন। তাঁরা আশ্চর্যান্বিত।

বামদেব বালকের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন আর পিঠে হাত বোলাচ্ছেন। পিঠে পাঁচ আঙ্গুলের দাগ। অভিমানী গলায় ভক্তদের বললেন—বাজ ফেলেছিলাম বলে মা কী রকম মেরেছে ত্যাখো।

দেখবে কী, ভক্তের চোখ জলে ভরে যায়।

* * *

তারাপীঠে বশিষ্টদেব যে তন্ত্রসাধনা করেছিলেন এবং রাজা গোঁসাই যে তন্ত্রে সাধনা করছেন তা প্রাচীন পঞ্চ-মকার। কিন্তু বামদেবের যে তন্ত্র সাধনা তাতে কোন মকার নেই। তিনি ছয়মাস বেলপাতা খেয়ে আর চরণামৃত পান করে মা মা করছেন। অর্দ্ধনিমীলিত চোখ জলে ভেসে যায় নারীদর্শনে। কিবা কিশোরী কিবা যুবতী।

বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ তীর্থ পর্যটন থেকে ফিরে বামদেবকে দেখলেন এবং তাঁর সাধন রহস্য বুঝলেন। বুঝে ভক্তদের বোঝাচ্ছেন—এ হল অন্তর্মৈথুন। মানস-উপচার তন্ত্রসাধনা, প্রাকৃত বহিরাচার সাধনা নয়। বামদেব নারীকে আর এক চোখে দেখছেন। এ চোখ সন্তানের নিষ্কাম দৃষ্টি। এই দৃষ্টিতে দেখলে নারীকে দেহাবস্থিত শক্তিরূপে অনুভব করা যায়। সে অনুভব দুঃখের প্রথম অবস্থায়। মনের ভারসাম্য থাকে না। কখনও শান্ত কখনও উগ্র। তোমারা অপেক্ষা কর, অচিরেই বাম স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। আর নির্বিকল্প সমাধি হবে।

যথার্থই তাই। আজ ধ্যানের পর বামদেব জীবিত কুণ্ডের জলে অবগাহন স্নান করলেন। সামান্য স্নান নয় তিনি জলে ডুবে রইলেন প্রহরের পর প্রহর।

তপোক্লিষ্ট দেহ শীতল হলে বামদেব উঠলেন। গর্ভধারিণী মাকে স্মরণ করলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে ললাটে যুক্ত কর স্পর্শ করলেন। কালু ভুলু কাছে এল। তিনি তাদের নিয়ে পদচারণা করছেন।

দিগম্বর দাসের বিধবা মা পাগলিনীপ্রায় বামদেবের পা জড়িয়ে ধরলেন—বাবা বাঁচাও।

কী ব্যাপার? দিগম্বরকে গোখরো সাপ কামড়াবে, বলেছেন এক সন্ন্যাসী। তাই ওরা ছুটে এসেছে বাবার কাছে।

বাবা বললেন—আমি কী সাপের ওঝা?

—তারও বেশী। ওঝার ওঝা তুমি। ভোলামহেশ্বর। বিধবা যুবতী জল ভরা কালো চোখ তুললেন—বাবা, আজ সাপে কামড়ানোর দিন।

পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় ক্রন্দসী মাতার মুখ চোখে এমন কী দেখলেন মাতৃসাধক, তিনিই জানেন। গভীরস্বরে বললেন—মায়ের আমার গুপ্তভাবে আপ্তলীলা।

মনেহয় বামদেব জগন্মাতার মুখ দেখেছিলেন দিগম্বরের মায়ের মুখে। বিশেষও যে অবিশেষও সে। যে দিগম্বরের মা সেই বিশ্বের মা। মায়ের আপ্তলীলা গুপ্তভাবে। মহামায়ার কত যে মায়া।

বামদেব কালুকে আদর করতে করতে দিগম্বরকে বললেন—যা, চান করে আয়।

দিগম্বর স্নান করে এলে বামদেব ওকে শিমুলতলায় পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসিয়ে দিলেন।

অকালসন্ধ্যা। গোখরো সাপ এল এবং আসনের চারপাশে অনেকবার ঘুরল। কিন্তু দিগম্বরকে দংশন করল না।

কথিত হল, বামদেব অলৌকিক শক্তি বলে বিধবার ছেলেকে রক্ষা করেছেন।

* * *

শিমুলতলায় ঝরা ফুলগুলি জমেছে। ডালে ধরছে পটলের মতন ফল। শীতের যাই যাই ভাব। কালু ভুলু এখন আর কুকুরকণ্ডলী হয়ে ঘুমোয় না।

অদূরে একটি আটচালা। মাঝখানে বেদী রয়েছে। শূন্যবেদী ঘিরে দু'চারজন ভক্ত বসে রয়েছেন। বামদেব তাঁদের একজন।

মোক্ষদানন্দ ধীর পায়ে এসে বেদীর ওপর বসলেন। শাস্ত্র আলোচনা আরম্ভ হল।

বামদেব—গুরুবাবা, বেদে পুরুষের বর্ণনা কী রকম?

মোক্ষদানন্দ—সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।

বামদেব—বেশ বলেছেন গুরুবাবা। তা প্রকৃতির বর্ণনা কী রকম?

মোক্ষদানন্দ—বেদে প্রকৃতি বলতে পৃথিবী, রাত্রি আর অগ্নি।

বামদেব—পুরুষের সঙ্গে ওদের সম্বন্ধ কী?

মোক্ষদানন্দ—অঙ্গাঙ্গী। দ্যাবা পৃথিবী। দৌ হল পিতা পৃথিবী হল মাতা। দ্যৌ রূপ পিতার রেতঃ হল বারিবর্ষণ, তার সিঞ্চনে মাতা পৃথিবী গর্ভধারণ করেন এবং সকল প্রকার শস্য জন্মায়।

বামদেব—বেদ ঠিক বলেছে গুরু বাবা। পিতামাতাই সব। তার থেকেই শিবশক্তি।

একভক্ত তারানাথ মুখ তুলে তাকালেন—বাবা, শক্তি সাধনা সম্বন্ধে কিছু বলুন।

বামদেব বললেন—কোন কথা শুনতে চাও বাবা?

—শক্তির বিকাশ কী করে হয়?

—চেষ্টায়, চিন্তায় আর কামনায়।

—আর একটু বুঝিয়ে বলুন বাবা।

—চেষ্টায় কর্মশক্তি, চিন্তায় জ্ঞানশক্তি আর কামনায় ইচ্ছাশক্তি বাড়ে। কর্মশক্তি বাড়লে ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করে অবিরল নামজপ করতে পারবে। জ্ঞানশক্তি বাড়লে একাগ্রচিত্তে ধ্যানধারণা জন্মাবে। ইচ্ছা বাড়লে চৈতন্যের উদয় হবে।

আর কথা হল না। একদল লোক খাটিয়া নিয়ে শ্মশানে উপস্থিত। খাটিয়া নামিয়ে ওঁরা বামদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন—বাবা এই হতভাগ্য যক্ষায় ভুগছে। একে বাঁচান।

—আমি কবরেজ নই। নিয়ে যাও।

—বাবা হতভগা মায়ের একমাত্র সন্তান।

এই কথায় বামদেব বিচলিত হলেন। দুঃখিনীর ম্লান মুখ চোখের সামনে ভাসছে। তাঁর বক্ষ ভাবাবেগে স্ফীত হল এবং শীতকাল হলেও স্বেদ ঝরে। তিনি তারা নামে জয়ধ্বনি দিয়ে যক্ষারোগীকে গলা চেপে ধরলেন। রোগীর রক্ত বমন হল। তিনি রোগীকে ঝাঁকুনি দিয়ে খাড়া করলেন। রোগী জল খেতে চাইল তিনি বললেন—নিয়ে যা। মায়ের চরণামৃত খেলে রোগ সেরে যাবে।

নিষ্ঠাভরে একমাস চরণামৃত পান করে মৃতপ্রায় রোগী সুস্থ হল।

*　　　　*　　　　*

এক যায় আর এক আসে।

মৃতবৎসা রমণী এসেছেন। উদ্দেশ্য দেবীদর্শন এবং দয়াল বামদেবের কাছে আর্তিনিবেদন। সাধকেরা আর্তনারীদের কৃপা করে থাকেন, এ কোন নারীর অজানা?

বামদেব মৃতবৎসার আকুল প্রার্থনা শুনে বললেন—তোর ছেলে বাঁচবে। ছেলেটি কিন্তু আমার চাই।

ব্যাকুল রমণী পূর্বাপর চিন্তা না করেই রাজী হয়ে গেলেন। অথবা চিন্তা করলেন, পুত্র যদি বাবার সেবক হয় সেও তো ভাগ্যের কথা।

যথাসময়ে রমণীর সন্তান হল। ছয় মাস পূর্ণ হলে, জননী বললেন—না, আমি আমার সন্তান দিতে পারব না।

বিবেক বলল—তুমি কিন্তু কথা দিয়েছিলে।

রমণী বললেন—সে মুখের কথা, অন্তরের নয়।

তখন বিবেক ভর্ৎসনা করে—মন মুখ এক করা উচিত ছিল সাধকের সামনে। তাঁকে অপ্রসন্ন কোরো না, অমঙ্গল হবে।

রমণী সন্তানকে বুকে চেপে ধরলেন। এ কী পরীক্ষায় ফেললে ঠাকুর। আমি এখন কী করি?

স্বামী বললেন—বামদেব ঈশ্বরের ন্যায় নিরাপদ আশ্রয়। সে আশ্রয় হারিও না।

পিতা মাতা সন্তানকে নিয়ে তারাপীঠে এলেন। মাতার মুখ ফ্যাকাশে চোখ দিশাহারা।

বামদেব মৃদু হেসে বললেন—বেশ ছেলে তো। যা, কুণ্ডের জলে চান করিয়ে নিয়ে আয়। ফুল বেলপাতাও নিয়ে আসবি।

ভয়ে রমণী মূর্চ্ছা যাওয়ার উপক্রম। মায়ের নামে বলি দেবেন নাকি? তন্ত্রসাধকেরা তো নরবলি দেয়। বললেন—আমার ছেলেকে নিয়ে কী করবেন, বাবা?

—দেখতে পাবি। যা, যা, আর দেরী করিস না।

রমণী চোখের জল মুছতে মুছতে ছেলেকে স্নান করালেন, পুরুষ ফুল বেলপাতা সংগ্রহ করলেন। উভয়েরই মন এত অস্থির যে বলার নয়। কী হবে কী হবে বড় ভয়।

বামদেব সুলক্ষণ নরশিশুকে মন্ত্রপূত করে ভূমির ওপর রাখলেন। শিশু কাঁদে না, হাত পা ছুঁড়ে পরম নিশ্চিন্ততায় খেলা করে। রমণী যতই দেখেন ততই অস্থিরতা চলে যায় এবং প্রশান্তি আসতে থাকে মনে। যখন রমণী ভাবছেন, বাবা যা করবেন তা ভালোর জন্যই তখন বামদেব বললেন—তোদের ছেলে এবার নিয়ে যা।

পুরুষ ও রমণী ত্বরায় বামদেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন।

কেন বাবা এরকম করলেন? পুরুষ অনেক ভেবেও কিনারা করতে পারেন না। সাধকের আচরণ সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অতীত।

* * *

এক যায় আর এক আসে।

বন্ধ্যা রমণী এসেছে রাজসাহী জেলা থেকে। সরোজকুমারী পুত্র কামনায় ডাক্তার বদ্যির কাছে গিয়েছে অনেকবার। কাজ হয়নি। বামদেবের অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে পিতা নিয়ে এসেছেন কন্যা-কে। সাধকই এখন ভরসা।

বামদেব আর্তি শুনে বিষণ্ণ হলেন। পুত্র না হলে সরোজকুমারীর স্বামী আবার বিয়ে করবে, তখন হতভাগিনী হবে উপেক্ষিতা। এর

পর সপত্নীর পুত্র হলে দাসীর দশা। তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হল। তিনি কোমলকণ্ঠে সরোজ কুমারীকে কাছে আসতে বললেন।

সরোজকুমারী যুবতী, শরীর আবৃত করে সম্মুখে বসল। তার মনে আশার জোয়ার এসেছে। মাতৃসাধক বামদেবের যখন কৃপা হয়েছে তখন আর ভয় নেই।

তবু সরোজকুমারী ভয় করে। শ্মশান ভৈরব অমন করে তাকিয়ে আছেন কেন? তিনি কী ভৈরবী রূপে গ্রহণ করতে চান? তন্ত্র-সাধকের জীবনে নারী সাধনসঙ্গিনী। উৎকণ্ঠায় যুবতী বধূর কণ্ঠ শুকিয়ে যায়।

মন্দিরের পাণ্ডা বামদেবকে ভোগ নিবেদন করলেন। অন্নের সহিত মৎস্য ও মাংসের ব্যাঞ্জন। তারানাথ একপাত্র মদ্যও নিবেদন করলেন। বামদেব বললেন—খাবি আয়।

কালু ভুলু এলে বামদেব সরোজকুমারীর দিকে তাকালেন—তুই ও খাবি আয়।

সরোজকুমারী সাহসে ভরকরে বামদেবের চোখে চোখ রাখল। লালসার কোন চিহ্ন নেই। যুবতী যতই দেখে ততই ভয় চলে যায়। একসময় নির্ভয়ে বামদেব এবং কালু ভুলুর উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করল।

তারপর কী যেন হয় সরোজকুমারীর। বেশবাস বিস্রস্ত অঙ্গ শিথিল দুচোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে।

বামদেব সরোজকুমারীর দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য এক গলায় বললেন —তারার আমার গুপ্তভাবে আপ্ত লীলা।

যথাসময়ে সরোজকুমারী মা হল।

[পাঁচ]

উনিশশো খ্রীষ্টাব্দ। শতাব্দীর শুরুতেই দেশ উদ্বেল। লর্ড কার্জন ঘোষিত বঙ্গ-ভঙ্গ নিয়ে আন্দোলন চলছে। বিদেশ থেকে যেসব জিনিষ আসছে তার দাম চড়া। তুচ্ছ লবণেরই কী দাম। ইংরাজ সরকারের অনুগ্রীহিতদের হাতে টাকা, তারাই কিনতে পারে জিনিষপত্র।

আটলা গ্রামের মানুষজন চিনি, কাপড়, কেরোসিন পায় না। চিনির অভাবে গুড় কাপড়ের অভাবে গামছা, কেরোসিনের অভাবে পাটকাটি ব্যবহার করে। অল্পে সন্তুষ্ট ওরা।

বড় দিদির হাতে কাটা সুতোয় বোনা দুটো গামছা নিয়ে রামচন্দ্র শ্মশানে গেলেন। বামদেবের দুটো গামছা লাগে। একটায় উর্ধাঙ্গ আর একটায় নিম্নাঙ্গ মোছেন। দুটো দু রংয়ের তাই গোলমাল হয় না।

রামচন্দ্র প্রণাম করলে বামদেব বললেন—দিদি কেমন আছে?

—ভাল না। বয়েস তো অনেক হল। পঁয়ষট্টি।

—হুঁ। তুই গানবাজনা করছিস?

রামচন্দ্র মাথা হেলিয়ে দিলেন। তারপর অনুগতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন মাসোহারার কথা। বামদেব বললেন, দ্বার ভাঙ্গার বাজার চল্লিশটাকা মনিঅর্ডারে পেয়েছেন কিন্তু নাটোরের রাণীর ষাট টাকা এখনও পাননি। আজকাল মনিঅর্ডারের বড় গোলমাল।

বামদেব আর কোন কথা বললেন না। রামচন্দ্র উঠলেন। কিছুক্ষণ পর অন্তরঙ্গ শিষ্য তারানাথ ও গুরু কৈলাসপতি উপস্থিত।

তারানাথ একজন ভক্তকে দেখিয়ে বললেন—বাবা, ইনি একটা সিন্দুক দিয়েছেন। ওতে প্রণামীর টাকা থাকবে।

তা নাহয় হল। কিন্তু টাকা আছে কী না কী করে জানবে?

—আওয়াজ হবে। এই শুনুন। টং টং।

—তুং তুং। টাকাও বলছে তুমি তুমি। বামদেব রহস্যের হাসি হাসলেন—মা, তুমিই সব।

তারানাথের কী খেয়াল বললেন—না। বাবাই সব।

—তুই আমার ওপর কথা বলিস? বামদেব রাগের ভান করলেন।

—আচ্ছা মা বাবাই সব। বললেন তারানাথ।

বামদেব উদাস হয়ে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর বললেন—আগে আমি তাই বলতাম। এখন বুঝেছি যে মা সেই বাবা। মূলে আদ্যা-শক্তি। সারভূত বীজ। ব্রহ্মবাচক প্রণব নাদে বীজ দ্বিধা হয়ে মা বাবা।

* * *

বামদেবের ইচ্ছা হয়েছে কলিতীর্থ কালীঘাটে মাকে দেখার। বাষট্টি বছর বয়েস হলেও স্বাস্থ্য অটুট, যেতে আসতে কষ্ট হবে না।

নগেন পাণ্ডা ও দুজন ভক্ত ভোরবেলা বামদেবকে নিয়ে বেরোলেন। মল্লারপুর স্টেশনে দলবল উঠল ইণ্টার ক্লাসে বামদেব সেকেণ্ড ক্লাসে। সহায় রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

হাওড়া স্টেশনে এক কাণ্ড। বামদেবের কোমরে সিন্দুকের চাবি বাঁধা ছিল, পড়ে গিয়েছে। চাবি হারিয়ে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। বালকের ন্যায় অবুঝ। চাবি চাই। রাজা যতীন্দ্রমোহন অশেষ উপায়ে তাঁকে শান্ত করলেন।

কালীঘাটে পৌঁছে আদি গঙ্গায় স্নান করলেন বামদেব। কালী দর্শন করছেন, সহসা মা মা বলে উচ্চৈঃস্বরে কান্না। কাঁদতে কাঁদতে আবদার ধরলেন, মাকে কোলে করে নিয়ে যাবেন তারাপীঠ।

হালদারগোষ্ঠী প্রমাদ গনলেন। তা কী হয়? মাকে নিয়ে গেলে তাঁদের চলবে কী করে? তাঁরা বাধা দিলেন।

ক্ষোভে বামদেব রুদ্রমূর্তি ধরলেন। তখন এক বারাঙ্গণা প্রয়াস পেলেন তাঁকে ভোলাবার। মেনকা যেমন বিশ্বামিত্রকে ভুলিয়ে ছিলেন

তেমনি তিনি ভোলাবেন। কিন্তু বামদেব অন্য এক সাধক। যুবতীর রূপ যৌবন দেখে বামদেবের রক্তে বাদ্যবাজনা বাজল না। তিনি রুদ্র রোষে বললেন—অবিদ্যা দূর হ।

অবিদ্যা মিলিয়ে গেল কিন্তু একেবারে গেল না।

*   *   *

বামদেবকে কালীঘাট থেকে পাথুরিয়া ঘাটায় নিয়ে এলেন রাজা। বিশাল রাজবাড়িতে মারবেল পাথরের মেঝে, বহু মূল্য ব্যাঘ্রচর্ম, ধূপের সুরভি, রাণীর আকুল সেবা সবই পড়ে রইল! বামদেব নিমতলা ঘাটে শবদেহের ওপর আসন করলেন।

তন্ত্রমতে শব সাধনায় মৃতের সঙ্গে জীবিতের ন্যায় ব্যবহারের নির্দেশ। বামদেব শবকে মদ মাংস খাওয়ালেন নিজেও খেলেন। তারপর উভয়ের একত্র রাত কাটে। শবও যা শিবও তা।

মধ্যরাতে বামদেব বীজমন্ত্র জপ শুরু করলেন। চরাচর স্তব্ধ। তিনি কালের যাত্রার ধ্বনি শুনতে পান। চিৎশক্তি ষট চক্রে আরোহণ অবরোহণ করে। কৈবল্যানান্দে তাঁর স্থিতি।

ব্রাহ্ম মুহূর্তে গঙ্গা স্নান করে বামদেব রাজবাড়ি ফিরলেন। এখন তিনি যে বামাক্ষ্যাপা সেই বামাক্ষ্যাপা। রাজা হারানো চাবি পাওয়া গেছে বলতে, নৃত্য জুড়ে দিলেন। সাধকদের ব্যাপার স্যাপার বোঝা ভার।

রাণী বিবিধ আহার্য নিয়ে এলে বামদেব বললেন—মা, তেলেভাজা দিয়ে চাট্টি মুড়ি খাব।

—বেশ বাবা। রাণী মুড়ি তেলেভাজা দিয়ে বললেন—বাবা মূলাজোড়ের কালীবাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য লোক এসেছে। যাবেন ?

বামদেব মাথা হেলিয়ে দিলেন।

প্রসন্ন ঠাকুরের কালীবাড়ি হয়ে বামদেব তারাপীঠ ফিরলেন। কেন যে তাঁকে দক্ষিণের কালীবাড়ি নিয়ে যাওয়া হল না, কে জানে। দক্ষিণে রামা বামে বামার মিলন হল না। হায়!

তারাপীঠে শারদীয় দুর্গাপূজার বিপুল আয়োজন। ঘট পট কলা বউ। ভোগ নৈবেদ্য উপাচার। ঢাক ঢোল সানাই কাঁসি। ধূপ ধূনো ফুল বেলপাতা, নাড়ু, কদমা, বাতাসা, কলা, বাতাবি, পাকা-পেয়ারা। দশভুজা মহিষমর্দিনী দেবী প্রতিমার পরিবর্তে আরক্তবদনা শিলাময়ী তারা।

তারার অষ্টরূপ। তারা চ উগ্রা মহাউগ্রা চ বজ্রানীলা সরস্বতী কামেশ্বরী ভদ্রকালী ইতি অষ্টৌতারিণী স্মৃতা। তারা দেবী তিব্বতের বৌদ্ধদেবী। তাঁর অষ্টরূপে দশভুজা দুর্গার উল্লেখ নেই।

আজ মহাষ্টমী। গ্রামবাসী জন নববস্ত্র পরিধান করে অঞ্জলি দিলেন। বহু ছাগ বলি হল।

ভূপতি পাণ্ডা প্রসাদী মাংস নিবেদন করলে বামদেব কালু ভুলুকে ডাকলেন। ভোগ খাওয়া হল। তিনি কালুর গায়ে গা এলিয়ে দিলেন। বিশ্রামের পর ভক্তদের সঙ্গে তন্ত্র নিয়ে কথা হচ্ছে। বললেন—তন্ত্র সাধনায় অনেক বাহ্যিক আচার।

—ওসবের দরকার আছে। এক ভক্ত জিজ্ঞেস করলেন।

বামদেব বললেন— নিয়ম মত করলে আন্তরিকতা আসে। ওটা দরকারী।

একজন প্রশ্ন করলেন—মাংস খেলে দোষ নাই?

ন মাংস ভক্ষণে দোষো, ন চ মৈথুনে, প্রবৃত্তিঃ এষা ভূতানাং নিবৃত্তিঃ তু মহাফলম্। বললেন বামদেব।

ভক্ত পুণর্বার প্রশ্ন করেন—মৈথুনেও দোষ নাই, বাবা?

বামদেব উত্তর করেন—দোষ আর কী। এ সব তো স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। লক্ষ্য হারিয়ে মত্ত হলেই দোষ। তন্ত্র সাধনার মহৎ কথা হল ভোগ যোগ এক করা।

কিছুক্ষণ সকলে চুপচাপ। প্রথম ভক্ত সাহস করে প্রশ্ন করলেন—আপনি ভৈরবী সাধনা করেছেন, বাবা?

বামদেব উত্তর করলেন না। রহস্যের হাসি হাসলেন—তারা আমার আশ্চর্য ভৈরবী।

মন্দির থেকে বাজানার শব্দ গ্যাসবাতির ছটা আসছে। বামদেব গুণ গুণ করেন। ভক্ত প্রণাম করে বিদায় নিলেন।

সন্ধ্যায় বামদেব মায়ের আরতি দেখতে গেলেন মন্দিরে। পঞ্চ-প্রদীপের আলোয় তিনি এক লাবণ্যময়ীকে দেখছেন। বিস্ময়ে তাঁর চোখের পলক পড়ে না। কে এই নারী?

নারীরও চোখের পলক পড়ে না। এই নারী কালীঘাটের বারাঙ্গণা তারাসুন্দরী। অবিদ্যা এসেছে নীলমাধবের প্ররোচনায়। তারাসুন্দরী সঙ্কল্প পাঠের মত মনে মনে উচ্চারণ করল: কালীঘাটে যা হয়নি তা তারাপীঠে হবে।

আরতির পর বামদেব ফিরে গেলেন শ্মশানে। চিন্তিত। দেখলেন তারানাথ বসে রয়েছেন তাঁর অপেক্ষায়। তিনি আসন গ্রহণ করে হাত বাড়ালেন। তারানাথ ত্বরায় নরকপালে মদ ঢেলে তাতে মেশালেন ভরিখানেক আফিং। বামদেব অমৃতজ্ঞানে হলাহল কণ্ঠে ঢেলে দিয়ে জয়ধ্বনি দিলেন—জয় তারা, জয় তারা।

তারাসুন্দরী সুনিবিড় কেশভার পিঠে এলিয়ে গৌরবর্ণ কপালে সিঁদুরের টিপ এঁকে যৌবনপুষ্ট শরীরে গেরুয়া দিলেন। ভৈরবী সাজে তিনি চলেছেন শ্মশানে ভৈরবের কাছে।

বামদেব তারানাথের দিকে তাকালেন। স্তিমিত দৃষ্টি, ভাবের ঘোর লেগেছে। বললেন—তারানাথ, কী যেন জিজ্ঞেস করছিলে?

—বাবা, আপনার দীক্ষা কত বছরে হয়?

—তেরো বছরে। তখন পৈতে হয়েছিল। ঐ উপনয়নই সাবিত্রীদীক্ষা। তারপর দেবশ্রবণ করি; ঐ আমার যোগদীক্ষা। তারপর বীজমন্ত্র লাভ, ঐ আমার তন্ত্রদীক্ষা।

—বাবা, তন্ত্রে ভৈরবী সাধনার বিধান আছে ?

—আছে বাবা। বামদেব ব্যস্ত হলেন—তুমি এখন যাও। আমি সাধনায় বসব।

তারানাথ প্রস্থান করলে ভৈরবী তারাসুন্দরী এলেন। বামা রমণ কুশলা। তাঁর দেহভোগ যোগাত্ম কৌলধর্ম।

তন্ত্রসিদ্ধ বামদেব সাধনচক্রে বসলেন। মহাষ্টমীর মহানিশি অতিবাহিত হল মহানন্দে।

প্রভাতে মহাসাধক বামদেবের সমাধিভঙ্গ হল। তিনি বললেন—তারা আমার আশ্চর্য ভৈরবী।

কথিত হল, বামদেব ভৈরবী গ্রহণ করেছেন।

* * *

সাধনায় প্রজ্ঞারূপিণী ভৈরবী যোগ্য সহায়।

বৌদ্ধ তন্ত্রের চীনক্রমে বহিরাচারের বিধান। এই ক্রমে আর্দ্রপন্থা। বজ্রাধরভৈরব ও প্রজ্ঞারূপিণী ভৈরবী প্রাকৃত মৈথুনে স্পন্দন অনুভূতি মহাসুখভাব এবং সহজানন্দ লাভে প্রয়াসী। হিন্দুতন্ত্রেও বহিরাচারের বিধান আছে। মহেশ্বর ভৈরব ও মহাশক্তি ভৈরবী প্রাকৃত মৈথুনে স্পন্দন অনুভূতি মহাসুখভাব কৈবল্যানন্দ লাভে সচেষ্ট।

তন্ত্রসাধনায় মানসাচারের বিধান আছে নীলক্রমে। নীলক্রমে শুষ্কপন্থা। ভৈরব আন্তরিকতায় শক্তিকে জাগ্রত করলে সহস্রার সহিত কুলকুণ্ডলিনীর মিলন ঘটে। অন্তর্মৈথুনে সাধকের দ্বৈত সত্তা (ভৈরব ও ভৈরবী)। তিনি স্পন্দন অনুভূতি মহাসুখ এবং সহজ বা কৈবল্য আনন্দ লাভ করেন আত্মনি এব আত্মনা।

তন্ত্রসিদ্ধ বামদেব শিষ্য তারানাথকে বললেন—তারা আমার আশ্চর্য ভৈরবী।

তারা নাম দেবীর, তারা নাম মানবীরও।

* * *

শ্মশানে ঘণ্টায় ঘণ্টায় আসছে মড়া। গ্রামে মড়ক লেগেছে।

মহামারী। এত মড়া দাহ করা যায় না। শেয়ালে কুকুরে মৃতদেহ ছিঁড়ে খাচ্ছে।

বামদেব একটি মৃতদেহ নামাতে দাঁড়ালেন।—এই মেয়েটার তো কর্মভোগ শেষ হয় নাই। এখনই মরা চলবে না। বলে পিতার অন্তরিকতায় ললাট স্পর্শ করলেন। হিম শীতল। তিনি ব্যাকুল হাত বামবক্ষে রাখলেন। প্রাণের স্পন্দন আছে কী নেই। তিনি ব্যগ্রভাবে অধর চুম্বন করলেন—মা। মা, আমার।

যুবতীর আত্মীয় স্বজন সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে বামদেবকে দেখছেন। কারও মুখে কথা নেই। যুবতীর পিতা বললেন—কল্যাণী আত্মহত্যা করেছে।

—কেন বাবা? বামদেব জিজ্ঞেস করেন।

—বামুনের ঘরের যুবতী বিধবার অনেক জ্বালা।

—তাই বলে আত্মহত্যা করবে। দেখাচ্ছি মজা।

বামদেব বারংবার চুম্বন করেন এবং মা বলে ডাকেন। কল্যাণী সাড়া দেয় না। তখন বামদেব যুবতীর স্তনে মুখ দিলেন। ঠিক যেভাবে শিশু স্তন্য পান করে সেই ভাবে। এক স্তন চোষেন এক স্তন খোঁটেন।

কল্যানী চোখ মেললেন ধীরে, অতি ধীরে। তাকে নিয়ে যাওয়া হল পাণ্ডার যাত্রী নিবাসে। সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা হল। তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।

সপ্তাহ শেষে বিদায়ের দিন এক কাণ্ড। কল্যাণী ভক্তিভরে বামদেবকে প্রণাম করলে, তিনি বললেন—ধনেপুতে বেঁচে থাক মা।

সকলে চমকে উঠলেন। বিধবার ধনেপুতে বেঁচে থাকা? পিতা বললেন—কল্যাণীর যে তাহলে অকল্যাণ হবে।

—তা আমি কী করব? তারা মা যে আমাকে বললে কল্যাণীর অনেক বিষয় সম্পত্তি আর ছেলেমেয়ে হবে। বামদেব উদাস হয়ে যান।

বৎসরান্তে কল্যাণী রামপুরহাটের এক ধনীব্যবসায়ীর সঙ্গে

গৃহত্যাগ করল। কালে যথার্থই তার বিষয় আশয় হল, ছেলেমেয়ে হল।

*   *   *

সাধক বামদেব শ্মশানে আশ্রয় নিলেও নিরিবিলিতে থাকতে পান না। ভক্তগণ বড়ই বিরক্ত করে। একভক্ত আসতে তিনি চেলা তারানাথকে বললেন—আমার বয়স হয়েছে। আমি আর লোকের রোগ সারাতে পারব না। বিদেয় করে দে শালাকে।

—বাবা, ইনি তত্ত্ব জিজ্ঞাসু। ফরাসডাঙ্গা থেকে সস্ত্রীক এসেছেন।

—অ। নিয়ে আয় তাহলে।

কার্তিক গোঁসাই ও তাঁর স্ত্রী বামদেবকে প্রণাম করে তন্ত্রমতে সাধনার অভিপ্রায় জানালে বামদেব অনুমতি দিলেন। প্রাথমিক দু'এক কথার পর গোঁসাই বললেন—ঈশ্বর কী বাবা।

—তিনি এক নিরাপদ আশ্রয়। শিশুর যেমন মা, প্রাপ্তবয়স্কের তেমনি ঈশ্বর। আমার যখন মা আছে তখন আবার ভয় কী ভাবতে পারা বড় সুখের।

—তাহলে তো ঈশ্বরকে মা ভাবাই ভাল।

—বটেই তো। ঈশ্বর না বলে বল ঈশ্বরী, ব্রহ্ম না বলে বল ব্রহ্মময়ী। বামদেব গান ধরলেন—'ব্রহ্মময়ীর চরণ তলে নির্ভয়ে তুই আপনা ভাসা।'

গোঁসাই চিন্তায় পড়ে গেছেন, প্রশ্ন করলেন—তিনি স্ত্রী না পুরুষ?

—তুমি যা ভাববে তাই। তিনি স্ত্রীও না পুরুষও না। অদ্বয়তত্ত্ব।

—একটু বুঝিয়ে বলুন বাবা।

—মূলে তিনি এক। তুমি আমি, উপগ্রহ, গ্রহ, সৌরলোক নক্ষত্রলোক, নীহারিকা ছায়াপথ, যাবতীয় জড় ও জড়শক্তি এবং তুমি আমি, বৃক্ষ, লতা, কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী, যাবতীয় প্রাণ ও প্রাণশক্তির মূলে চৈতন্য। এই অদ্বয়তত্ত্ব উপলব্ধির বিষয়। সাধনা কর বুঝতে পারবে।

—সস্ত্রীক করবো তো বাবা।

—সাধক জীবনে বিদ্যা স্ত্রী সহায়। বামদেব রহস্যের সুর ধরলেন—অদ্বয়তত্ত্ব জীবের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী রূপে দ্বিধা বিভক্ত। তত্ত্ব মূলে এক, তাই একঅংশ পুরুষ আর একঅংশ নারীর মিলন স্পৃহা, যার নাম কাম। এই কামকে প্রেমে পরিণত করার জন্যই সাধনা। বুঝেছ বাবা?

গোঁসাই বুঝুন আর না বুঝুন, মাথা হেলিয়ে দিলেন।

* * *

বামদেব শিমুলতলায় তারামায়ের চিন্তায় বিভোর, প্রবল বারিপাতেও কোনরকম অস্থিরতা নেই। সমভাব। জলস্ফীত দ্বারকার গর্জন মত্তবাতাসের শন্ শন্ শব্দ বুঝি কান পেতে শুনছেন। গান ধরলেন—'শোন্ শোন্ করি কেন বা ডাকিছ, শুনিতে চাহিলে কথা না কহিছ, হংসরবে আসিছ যাইছ, এ প্রাণ রেখেছ ধরা দিতেছ না।'

বামদেব গাইছেন এক কান্তিমান যুবক ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করলেন। তিনি যুবককে বললেন—কী চাও, বাবা?

—আমি অবিশ্বাসী, আমায় বিশ্বাস দিন।

—মাকে ডাকো। তিনি বিশ্বাস দেবেন।

—মা কে?

—যখন মায়ের দেখা পাবে, তখন তাঁকেই জিজ্ঞাসা কোরো।

—তাই হবে। যুবক চুপ করলেন।

যুবকের নাম নিগমানন্দ। তিনি আর একটিও কথা না বলে নামজপ সুরু করলেন। প্রহর কাটে। প্রহরে প্রহরে দিবানিশি।

কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাতে বামদেব যুবককে শবের উপর বীরাসনে উপবেশন করালেন। কপালপাত্রে কারণ বারি দিয়ে বললেন—পান কর। করে একাগ্র হও।

যুবক একাগ্র হলে আপন সত্তায় বিভোর। দুই ভুরুর মাঝখানে

প্রাণ আবিষ্ট। সহসা হৃদয় অকারণ পুলকে ভরে গেল। তিনি অতীন্দ্রিয় অনুভূতির বলে ঘনান্ধকারে অরূপকে রূপে প্রত্যক্ষ করলেন। অপরূপ রূপময়ী রমণীকে সাহসের সহিত জিজ্ঞাসা করলেন—মা, তুমি কে?

—তুমি যা বলবে তাই। রমণী মিলিয়ে গেলেন।

সাধক রূপময়ীকে বেশীক্ষণ রূপে ধরে রাখতে পারলেন না। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বড়ই ক্ষণস্থায়ী। রূপ নিমেষে রূপাতীত অরূপে অপ্রত্যক্ষ হয়ে যায়।

নিশাবসানে বামদেব সাধককে মধুরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—মাকে জেনেছ?

—জেনেছি।

নিগমানন্দের কণ্ঠে প্রত্যয়ের সুর গম গম করে বাজে।

বামদেব শিষ্য নিগমানন্দকে প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করলেন।

* * *

ফরাসডাঙ্গার কার্তিক গোঁসাই এসেছেন তারাপীঠে। তিনি কাম ও প্রেম নিয়ে অনেক ভেবেছেন, তবু ভাবছেন। ভাবনা ফুরোয় না। সভয়ে বামদেবকে জিজ্ঞেস করলেন—কাম কোন গুণ বাবা? রজঃ না তমঃ?

—ভোগে তমঃ না হলে রজঃ।

—কামের নাশ নাহলে কী প্রেম আসবে?

—নাশ হলে তো সবই গেল, কাকে রূপান্তরিত করবে বাবা? ভেগে মজে যেও না। ভোগ যোগ একসঙ্গে করলেই প্রেম আসবে। শরীরের চাহিদা মেটানো হল ভোগ। ভোগে শরীর তুষ্ট হয়। তবে পরিমিত আহারে ও বিহারে। শিশ্নোদর বলে একটা কথা আছে। শুনেছ?

—হাঁ বাবা। শিশ্ন ও উদর।

—ও ছুটোর চাহিদা মেটাবে কিন্তু তোয়াজ করবে না। করলে খাই খাই বাড়বে। মন পড়ে থাকবে শিশ্ন ও উদরে। আত্মচিন্তা মনে আসবে না।

গোঁসাই আবার ভাবনায় পড়লেন। এ ভাবনা হতাশার। তুঃখের গলায় বললেন—তারানাথ বা নিগমানন্দের মত সংসারত্যাগীরাই ইষ্টলাভ করতে পারে। সংসারীরা পারে না।

—কেন বাবা ?

—সংসারীর সং সাজাই সাজে আর কিছু সাজে না।

—কে বলেছে ও কথা গোঁসাই। জোটে ব্যাটা তোমাদের জন্য সহজ পথ দেখিয়েছেন। তোমার মত উনারও ধর্মপত্নী আছেন। তিনি তাঁকে শক্তিভাবে দেখেন। তুমি কী তাই দেখ ?

গোঁসাই স্ত্রীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর জীবনে নারী এক কঠিন সমস্যা। ধরলেও জ্বালা ছাড়লেও জ্বালা।

গোঁসাই মুখ ঝুলিয়ে মন্দিরে ফিরে গেলেন।

বামদেব বসে রয়েছেন কালু ভুলুদের নিয়ে। কুকুরগুলো ওঁর ছেলেমেয়ের মতন। ভোগের সময় হয়েছে বুঝে বললেন—কোথাও যাসনি। খাবি আমার সঙ্গে।

নিগমানন্দ গান করতে করতে বামদেবের কাছে এলেন। মুখে রহস্যের মৃতু হাসি। বললেন—বাবা, স্তম্ভন, মারন বশীকরণ সম্বন্ধে কিছু বলুন।

—ও সবে আগ্রহ কেন ? হেলে ধরতে পার না কেলে ধরতে চাও ?

—ধরতে চাই না, জানতে চাই।

—তুরকম ব্যাখ্যা আছে বাবা। আমি তোমাকে সৎ ব্যাখ্যাটাই শোনাচ্ছি। ইন্দ্রিয় থেকে মনকে সরিয়ে স্থিতধী হওয়াই স্তম্ভন, অবিদ্যা নাশই হল মারণ, ধীশক্তিকে বশ করাই বশীকরণ।

মারণ, স্তম্ভন, বশীকরণ, এ সবই তন্ত্রসাধনার বিভিন্নস্তর।

আলোচনা চলছে নগেন পাণ্ডা ভোগ নিয়ে এল। বামদেব তাঁর সন্ততিদের নিয়ে খেতে বসলেন। নিগমানন্দ আর কোন প্রশ্ন করলেন না। উঠলেন।

* * *

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন। তারাপীঠে মেলা বসেছে। এই চতুর্দ্দশীতিথিতে বশিষ্ঠদেব তারামায়ের দর্শন পেয়েছিলেন। সেই উপলক্ষে মেলা।

মুর্শিদাবাদ থেকে কুমারানন্দ এসেছেন। মেলা দেখতে নয়। তাঁর মন জুড়ে বৈরাগ্য, পার্থিব কোলাহল তাঁকে আকর্ষণ করে না। তিনি ঈশ্বরমুখী। গৃহত্যাগের সঙ্গে গৃহিণী ত্রিপুরানন্দময়ীকে ত্যাগ করেছেন। তাঁর ধারণা কামিনী কাঞ্চন না ছাড়লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

কুমারানন্দ শ্মশানে এসে বামদেবের পা জড়িয়ে ধরলেন—বাবা, দীক্ষা দিন।

—দীক্ষা! বামদেব শরণাগতের দিকে বিরক্তির চোখে তাকালেন—তোর স্ত্রী ঘরে চোখের জল ফেলছে আর তোকে দীক্ষা দেব। আমার দ্বারা হবে না।

—দয়া। কুমার অত্যন্ত কাতর হয়ে বলেন—বাবা, দয়া করুন। আমি আপনার সন্তান।

সর্বত্যাগী বামদেবের মনে করুণার সঞ্চার হল। আহা! সংসার জ্বালায় অতিষ্ঠ মানুষ শান্তির মুখ দেখতে চাইছে, তাকে নিরাশ করবেন? বললেন—আগে স্ত্রীর ব্যবস্থা কর, তারপর সাধনা।

—কী ব্যবস্থা? ওকে, এখানে নিয়ে আসব?

—যদি আসতে চায় নিয়ে আয়।

—বেশ বাবা।

কুমার ত্বরায় মুর্শিদাবাদ ঘুরে এলেন। সঙ্গে স্ত্রী। উভয়ে সর্বান্তঃ-

করণে বামদেবের সেবায় লাগলনে। প্রায় একবছর পর বামদেবকে বললেন—বাবা, দীক্ষা।

বামদেব আকাশের দিকে তাকালেন যেন তারামায়ের ইঙ্গিতের অপেক্ষায়। সহসা বললেন—বাবা আমি তোমার গুরু নই। রাজা গোঁসাই আর্দ্রপন্থী তন্ত্রসাধক, তিনিই তোমাকে দীক্ষা দেবেন।

* * *

অমাবস্যার রাতে কুমার ও ত্রিপুরাকে জবুকের কৈলাস পতি তারা মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে বললেন—নরাঃ বজ্রধরাকারাঃ সাধককে তার বজ্রধর স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। স্ত্রিয়ঃ সর্বা প্রজ্ঞাপারমিতাত্মিকা। বিশ্বের সকল স্ত্রী প্রজ্ঞাপারমাত্মিকা। সাধিকাকে তার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

রাজা গোঁসাইয়ের নির্দেশমত কুমার ও ত্রিপুরা আর্দ্রপন্থায় তন্ত্রসাধনা করেন। ধীরে তাঁদের উত্তরণ ঘটল। ভোগ থেকে যোগ। এখন ত্রিপুরার সান্নিধ্য কুমারের ইন্দ্রিয়ে আঘাত করে না। কাম রূপান্তরিত হয়েছে প্রেমে।

আজ ভৈরবী ত্রিপুরার এক কাণ্ড। সারা বেলা দুধ জাল দিয়ে ক্ষীর করলেন। ঘন ক্ষীরের নাড়ু হল। সন্ধ্যায় ত্রিপুরা সেই নাড়ু বামদেবকে খেতে দিলেন।

বামদেব নাড়ু খেতে খেতে বললেন—বেশ হয়েছে ভৈরবী মা। মাঝে মাঝে খাওয়াস।

—খাওয়াব বাবা। ত্রিপুরা দুচোখ ভরে বুড়োছেলের নাড়ু খাওয়া দেখছেন। সহসা তৃষিত হৃদয়ে অপত্যস্নেহের ঝড় উঠল। দু চোখ জলে ভেসে যায়। কী আশ্চর্য। ত্রিপুরার শুকনো বুকে দুধের সঞ্চার হল। এমনি প্রবলতা যে দুধ আপনি ঝরে।

দিন যায়। ত্রিপুরা এখন কেবলমাত্র ভৈরবী নন, তিনি ভৈরবী মা।

ত্রিপুরা তাঁর সাধক ছেলেকে নিয়ে বড় ভাল আছেন। কিন্তু বেশীদিন থাকতে পারলেন না। তাঁকে স্বামীর সঙ্গে মুর্শিদাবাদ ফিরতে হল।

*　　*　　*

কয়েক বছর পর।

তারা সুন্দরী আবার এসেছেন তারাপীঠে। চল্লিশের কাছাকাছি হলেও আগের মতই বরাঙ্গনা। কিন্তু অন্য এক নারী, কেননা তাঁর মন জেগেছে।

তারাসুন্দরী আজ আর বারাঙ্গনা নন। দেহবেসাতি অনেক হয়েছে। আর কামার্ত পুরুষের পরিচর্যা নয়। এবার তিনি সাধু সন্ন্যাসীর সেবা করবেন।

তারাপীঠে সাধুসন্ন্যাসীর মেলা। কৈলাসপতি, মোক্ষদানন্দ বামদেব তো রয়েছেনই আরও রয়েছেন তারানাথ নিগমানন্দ। নবীন সাধকও অনেক রয়েছেন। তারাসুন্দরী সকলের সেবা করেন। দিনান্তে একবার আহার। রাত্রির মধ্যযাম পর্যন্ত নামজপ। আর সুযোগ পেলেই শাস্ত্রকথা শ্রবণ। সংযম পরায়ণা তপোক্লিষ্টা তারাসুন্দরীকে দেবীর ন্যায় মহিমাময়ী দেখায়।

দেবী রূপ দেখে অসুরের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছিল। আর্দ্রপন্থী নিসঙ্গ সাধকেরও ঘটনা তিনি কামনা করলেন তারাসুন্দরীকে। কিন্তু সংযমপরায়ণা সাধিকা সঙ্কল্পে অটল। তিনি আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন নিঃসঙ্গ সাধক বোঝান—নারী বিধাতার অপূর্ণ সৃষ্টি। পুরুষকে অবলম্বন করেই তার পূর্ণতা।

—না! তারাসুন্দরী প্রত্যয়ের গলায় বললেন—নারী একক সাধনারও অধিকারী। তার দেহেও কুণ্ডলিনী বিরাজিতা।

—এমন কথা তন্ত্রে নাই।

—আছে। পুরুষ ও প্রকৃতি অভিন্ন। নিগমতন্ত্রে প্রকৃতি গুরু।

তারাসুন্দরী ধরা দিলেন না।

ঋতু চক্রের আবর্তনে বছর যায়। তারাসুন্দরী রোদে পুড়ে জলে

ভিজে সাধকদের সেবা করেন আহার বিহারে সংযম করেন আর প্রহরের পর প্রহর জপ করেন। রূপ ঝরে যায় কিন্তু চৈতন্য অস্ববিত হয়। তাঁর দুঃখ কষ্ট থাকে না। যা দেখেন যা শোনেন তাতেই আনন্দ। যা ভাবেন যা করেন তাতেই আনন্দ।

তারাসুন্দরীর সাধনায় মুগ্ধ হয়ে বামদেব বললেন—তারা আমার আশ্চর্য ভৈরবী।

* * *

শিমুলতলায় কালু ভুলু ইত্যাদি সারমেয় দল পরিবৃত হয়ে বামদেব সুখাসীন। শ্বেতফুলিকে বললেন—তুই আর মা হলি না।

কুক্কুরীও বন্ধ্যা হয়। আর বন্ধ্যা হলে অক্ষত যোনি। কোন কুকুর তার সঙ্গে মিলিত হয় না। পশুদের জগতে প্রজননের জন্য সহবাস। যেখানে জন্ম সম্ভব নয় সেখানে পশু বিমুখ। মানুষের জগতে তা নয়। বন্ধ্যা নারীর সঙ্গে মিলিত হয় পুরুষ। সুখের প্রজনন ক্রিয়াটা থাকে কিন্তু সন্তান থাকে না বন্ধ্যা নারীর।

সর্বমঙ্গলা এক বন্ধ্যা নারী। তিনি প্রতিরাতে স্বপ্ন দেখছেন আর মাস গেলে কাঁদছেন। তিনি চিকিৎসার জন্য স্বামীকে ধরলেন। নবীনচন্দ্র স্ত্রীকে নিয়ে গেলেন বৈদ্যের কাছে। বৃথা চেষ্টা। তারা তারাপীঠ যাত্রা করলেন। যদি শ্মশানভৈরব বামদেবের কৃপা হয়।

তারাপীঠের শ্মশান সর্বমঙ্গলা ডাকের অপেক্ষায় বসে আছেন। ব্যাধি ও ব্যথা তাঁর যৌবন ভাগাভাগি করে খেয়েছে। শরীরে সামগ্রী বলতে কিছু নেই। বিশীর্ণ মুখে ডাগর চোখদুটি জ্বলজ্বল করে।

বামদেব কৃপাপ্রার্থিনীর স্বামীকে বললেন—বাবা, চিকিৎসা করাও নাই?

—করিয়েছি।

—ঠিকমত হয় নাই বাবা।

মায়ের আমার শারীরিক দোষ নাই।

সর্বমঙ্গলা মুখ তুলে তাকালেন। চোখ দিয়ে জল পড়ে।

বামদেব সহানুভূতির গলায় বললেন—কাঁদিস না মা, ব্যাধি সেরে যাবে।

আর্তনারী বামদেবের পা জড়িয়ে ধরলেন—আপনার একটা কৃপা চাই।

বামদেব বন্ধ্যানারীকে কৃপা করলেন।

বৎসরান্তে সর্বমঙ্গলার পুত্র হল।

শ্বেতফুলি কিন্তু বন্ধ্যাই রয়ে গেছে। বামদেব ওকে বলেছিলেন—তুই আর মা হলিনা।

* * *

মাঘের শীতে বৃক্ষ লতা পশুপক্ষী সকলেই কাতর। শিবাকুলের গলায় জোর নেই, মিন মিন করে ডাকছে।

বামদেবের বাহাত্তর বছর বয়স, তিনিও শীতে কাতর। এক ভক্ত হুইস্কির বোতল বের করলে বললেন—দে, ফট্ করে দি।

তারপর কী যে তাঁর খেয়াল ভক্তকে মৃত্যু দেখাতে শুয়ে পড়লেন। বিপুল শরীর কাঁপতে কাঁপতে স্থির। এক চিকিৎসক ভক্ত নাড়ী পরীক্ষা করে বললেন, জীবনের কোন চিহ্ন নাই।

তখন ভৈরবীগণ ভীত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। মহাভৈরব কী দেহ রক্ষা করলেন? এ কী ইচ্ছা মৃত্যু?

এখন পঞ্চমুণ্ডি আসনের একটি মুণ্ডের মুখে যেন কথা ফুটল। ভৈরব ও ভৈরবীগণ বুকের ভেতর শোনে—জীবনমৃত্যু সিদ্ধপুরুষের ইচ্ছাধীন। আর তাদের ভয় কেটে যায়।

কিছুক্ষণ পর বামদেব উঠে বসলেন। মানুষ ঘুম ভেঙে যেমন উঠে বসে তেমনি। ভক্ত শ্যামানন্দ গাঁজা সেজে দিল গুরুর হাতে। কলকের মাথায় ধিকি ধিকি আগুন। বামদেব কাল বিলম্ব না করে কলকেতে সজোরে টান দিলেন। কলকে ফট্ হয়ে গেল আর তিনি শিবনেত্র হলেন। এখন ভৈরবদের প্রসাদ পাওয়ার কী হবে? তারা অন্যত্র গেল।

নেশা ভাঙলে বামদেব শ্মশান ছেড়ে গ্রামের সীমানায় একটি কুঁড়ে ঘরের সামনে এসে ডাকলেন—গুপী।

—ক্ষেপাদা। ভিতর থেকে আওয়াজ আসছে। আমার উঠবার শক্তি নাই।

বামদেব হেঁট হয়ে কুঁড়েয় ঢুকলেন।

গুপীর অভাবের সংসার। বিছানা বলতে চট আর কাথা।

তৈজসপত্র বলতে মাটির হাঁড়িকুঁড়ি। স্ত্রীর ছিন্নাবস্ত্রে লজ্জা ঢাকে না। তিনি স্বামীর বন্ধুকে বললেন—মানুষটা রোগে পড়ায় বড় অভাব।

—সি তো দেখতেই পাচ্ছি।

—বাঁচবে?

—নিশ্চয়। বামদেব আশ্বাস দিলেন—আগে আমি যাব তারপর গুপী যাবে।

গুপীর স্ত্রীর বড় অস্বস্তি হয়। এত বড় সাধকের মুখে এই কথা। তিনি কেঁদে ফেললেন।

নারীর চোখের জল বামদেব সহ্য করতে পারেন না। শশব্যস্ত বললেন—মন্দিরে যাও তারা মায়ের চরণামৃত নিয়ে এস। গুপীকে খাইয়ে দি। দেখো, তাহলেই সেরে উঠবে।

গুপীর স্ত্রী প্রত্যয় গেলেন। তাঁর হাসি ফুটল। বিশুষ্ক ঠোঁটে হাসি এবং কোটরে বসা চোখে জল।

তাই দেখে বামদেব মনে মনে বললেন রোদবৃষ্টি একসঙ্গে।

* * *

শশীভূষণ জোর করে বামদেবকে ভাগলপুর নিয়ে যাচ্ছেন। শ্মশানভৈরবের শ্মশান ছাড়া কোথাও থাকতে ভাল লাগে না। বললেন —শশীবাবা, আমি তো ধর্মপ্রচারক নই। তবে ক্যানে টানাটানি করছ।

— কত নরনারী আপনকে দেখতে চায়।

—ই তোমার মনের কথা লয় বাবা। তুমিই লোককে দেখাতে চাও। দেখিয়ে কোন লাভ নাই বাবা।

—আর কখনও কষ্ট দেব না।

—দেবে কোথা থেকে। বামদেব হাসলেন—ইবার আমি ফট্‌ হব।

শশীভূষণ শিউরে উঠলেন।

ভাগলপুরে অনেক বাঙ্গালীর বাস। শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক আইনজীবী। দর্শনশাস্ত্রের এক অধ্যাপিকা জীবজগৎ ঈশ্বরের কথা পাড়লেন। ন্যায় সংখ্যা বেদান্ত থেকে কত উদ্ধৃতি।

বামদেব বললেন—তুমি খুব রুজরুগ হয়েছ মা।

—হয়েও তো পেলাম না কিছু।

—কী তুমি চাও ?

—ঈশ্বর দর্শন।

—তাহলে তাঁকে ডাকো। আকুল হয়ে ডাকলেই তাঁর দর্শন পাবে।

—প্রথমেই দর্শন ?

—প্রথমেই না দ্বিতীয়েই জানি না। ডাকো।

বামদেব চোখ বন্ধ করে নামজপ সুরু করলেন। তাঁর অধ্যাপিকার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে না।

*　　*　　*

তারাপীঠে ফিরে বামদেব সবে স্বস্তির শ্বাস ফেলেছেন, এক উপদ্রব। পীঠস্থানে এমন কখনও কখনও হয়।

বৈশাখ মাস। রোদ মাথায় করে এক জোড়া যুবক যুবতী উপস্থিত। হাতে ত্রিশূল, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, অঙ্গে গৈরিক বসন। ভৈরব ভৈরবী শিমুলতলায় আসন করে বসলেন। কালু ভুলু সশব্দে আপত্তি জানাল, ওরা গ্রাহ্যই করল না।

বামদেব দূর থেকে ভৈরব ভৈরবীকে নিরীক্ষণ করলেন। ভ্রূ কুঞ্চিত এবং নাসারন্ধ্র স্ফীত হল। তিনি উত্তেজিত হয়েছেন।

এই উত্তেজনা কেন ?

অনধিকারীর স্পর্ধা দেবে। পবিত্র শিমুলতলে কামার্ত যুবক ভৈরবী সাধনায় ভড়ং করছে। মনে এতটুকু দ্বিধা নেই।

বামদেব বললেন—কে তুই ?

—তন্ত্র সাধক।

—ই রমণী কে ?

—আমার উত্তর সাধিকা।

—কুথায় জোটালি ?

যুবক নিরুত্তর।

বামদেব ক্রোধে ভীষণ দর্শন হয়ে উঠছেন। আরও চক্ষু কম্পমান বপু। ঘন ঘন শ্বাশ বয়। তিনি জোরে যুবকের কেশ আকর্ষণ করলেন —নেমে আয় শালা, নষ্টামি করার আর জায়গা পাস নাই।

আকস্মিক আকর্ষণে ধরাশায়ী ভৈরবের অচৈতন্য অবস্থা ? চোখ কপালে উঠেছে। কমবয়সী ভৈরবী রোদন করছে।

বামদেব তরুণীর দিকে তাকালেন—সীতা সাবিত্রীর দেশের মেয়ের ই কী কাজ মা ?

তরুণী লজ্জায় নিরুত্তর যেমন মুখ ঝুলিয়ে কাঁদছিল, তেমনি কাঁদছে বামদেব তাকে আর কিছু বললেন না। ধরাশায়ী ভৈরবকে বললেন—ভাগনীকে ভৈরবী সাজিয়ে ঢং করা হচ্ছে। ভাগ শালা।

কপট ভৈরব কালবিলম্ব না করে ভাগনীকে নিয়ে চলে গেল।

কত লম্পট যুবতী মেয়ে নিয়ে আসে চক্রে বসে। সুখের আশায় আর কৌতূহলের বশে। অর্বাচীনের কাছে তন্ত্র বড় মজার জিনিষ।

* * *

তন্ত্রসাধক অনন্ত বাঁড়ুজ্জের সাঁইথিয়ায় নন্দীপুরে বাড়ি। উপাস্যা দেবীর মন্দির অরণ্য সাদ্রশ গভীর আম্রকাননে। দেবীর নাম নন্দিনী।

সেখানে রয়েছেন বামদেব। মন্দির প্রাঙ্গনে বসে কারণ বারি পান করছেন। পাত্র শেষ হলে অনন্ত ভরে দিচ্ছেন। এমন সময়

সাঁইথিয়ার জমিদার তাঁকে প্রণাম করলেন। বামদেব স্নেহভরে জমিদারের দাড়ি টেনে বললেন—মুখে অনেক ঘাস হয়েছে বাবা।

কথা শুনে অনন্তর হাসি পেল তিনি মুখ লুকোলেন। হাসলে বামদেব রেগে যাবেন। বললেন—গুরুর সামনে দাঁত কেলানো হচ্ছে।

সুরাপানের পর গঞ্জিকা সেবন। কলকে সাজা হল। বামদেব প্রসাদ করে দিলে অনন্ত গ্রহণ করলেন ধূমায়মান কলকে।

নন্দীপুর থেকে তারাপীঠ ফেরার সময় এক কাণ্ড। বামদেব যে রেল-গাড়ীতে ফিরবেন সে গাড়ি চলছে না। ছাড়ার সময় পার তবু গাড়ি স্থির। কবির কবিতায় বললে এই রকম। 'গোরাগার্ড রাগে করে গরগর, উড়াইছে সবুজ নিশান জোরে। শিটির ওপর শিটি দেয় খালি, ট্রেনের চাকা ঘুরে না ঘোরে।' বামদেব গাড়ির কামরায় উঠলে কলের গাড়ির চাকা ঘুরল।

কথিত হল, এ সবই বাবার মাহাত্মি।

তারাপীঠে বামদেবও ফিরলেন আর বৃষ্টি ও নামল। শ্মশানের সকল সাধক সাধিকাই চালা ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন, একা বামদেব শিমুলতলায়। তিনি নির্বিকার।

সকালে বৃষ্টিধোয়া গাছ-গাছালি রোদে ঝলমল করছে। নদী তীরে বালুকার বেদীর ওপর এক কুমারী কন্যাকে দাঁড় করিয়ে বামদেব পুজো করছেন। তাঁর দুচোখে বারিধারা অধর ওষ্ঠ নড়ে। তিনি কুমারীকে অন্তরের প্রার্থনা নিবেদন করছেন।

* * *

বামদেব মাঝে মাঝে বেশ মজা করেন। কয়েকদিন আগে এক ভক্তের মাথায় হুইস্কির বোতল ভেঙ্গে ছিলেন। আজ আবার নিজের মাথায়—

ভরতপুর। বামদেব মাথায় একটি পাছায় একটি ইট নিয়ে চুপ-চাপ বসে আছেন। চুপচাপ কিন্তু গলদঘর্ম অবস্থা ভক্ত রাজেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন—একী বাবা?

বাবা হেসে উত্তর দিলেন—অট্টালিকা ভোগ করছি বাবা। বড় কষ্ট। মাথায় লাগে পোঁদেও লাগে।

রাজেন্দ্রনাথের হাসি পেল কিন্তু হাসলেন না। হাসলে বাবা রাগ করেন। বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে এলেন শিমুলতলায়।

অমনি বামদেব বদলে গেলেন। এখন তিনি মহাজ্ঞানী। ভক্তদের বললেন—হৃদয়ে দ্বাদশদল পুষ্প সদৃশ এক পদ্ম। দলগুলি চঞ্চলতা কপটতা ইত্যাদি দ্বাদশবৃত্তি। মাঝে মাঝে চঞ্চলতা আমাকে পেয়ে বসে। তোমরা কিছু মনে কোরো না বাবা।

পরদিন বামদেবের এক কাণ্ড। তিনি মন্দির থেকে যাবতীয় মূল্যবান্ বস্ত্র বের করে আগুন ধরিয়ে দিলেন?

নগেন পাণ্ডা ছুটে এলেন—এ কী করছেন বাবা?

বাবা হেসে উত্তর দিলেন—হোম করছি।

হোম শেষ করে বামদেব জীবিত কুণ্ডে স্নান করলেন। আবার তিনি জ্ঞানীপুরুষ। ভক্তদের বললেন—যজ্ঞ চার রকম। আমি যেটা একটু আগে করলাম সেটা দ্রব্য যজ্ঞ।

ভক্তগণ শুনলেন। শুনে কিছু বুঝলেন কিছু বুঝলেন না। মহাপুরুষদের কথা বড়ই গভীর।

বৃষ্টি নামতে ভক্ত সারদা সাহা বামদেবকে বসালেন আট চালায়। তারপর হাতের ডিবে আর বোতল, মেঝেয় নামিয়ে খুললেন। চিংড়িও কাঁকড়ার ঝাল সহযোগে মদ্যপান চলল। বামদেব মহানন্দে একটি গান রচনা করলেন—'কহে বামাক্ষ্যাপা, তারা বেদো বেটী; কুঁচলে করলে সব মাটি॥'

[ছয়]

উনিশ এগারো খ্রীষ্টাব্দ। রাজচক্রবর্তী পঞ্চম জর্জ দিল্লী দরবারে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করার আদেশ দিলেন। দেশের মানুষ শান্ত হল। গণ-আন্দোলন মন্দীভূত হলেও সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ থেকে যায়। রাঢ় বাংলার বীরাচারী তন্ত্র সাধকেরা দেশমাতৃকার চরণে প্রাণ উৎসর্গ করলেন।

তারানাথ জপতপ ছেড়ে যোগ দিলেন বিপ্লবীদের দলে। পরাধীনের আবার সাধন ভজন। আগে দেশস্বাধীন হোক তারপর অন্য-কথা। তারানাথ এবং তাঁর সঙ্গীরা ইউরোপের রণদামা শুনে আশায় বুক বাঁধলেন। জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংরেজ যুদ্ধে নামলে আঘাত করার সুযোগ আসবে।

তারানাথ বহরমপুর গেলেন। বৃদ্ধ বামদেবকে ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না, তবু গেলেন। দেশমাতার ডাক যে শুনতে পায় তার এমনি হয়।

সেবকের অভাবে চুয়াত্তর বছর বয়েসের বামদেব অবসন্ন। সে মানুষ এতকাল শ্মশান দাপিয়ে বেড়িয়েছেন, তিনি আজ নিজে স্নান করতে পারেন না। রক্ত মাংসের শরীরের ধর্মই এই। বুদ্ধদেব স্বহস্তে চীবর প্রসারিত করতে পারছিলেন না, আনন্দ করলেও তিনি শায়িত হয়েছিলেন।

ভক্ত ক্ষিতীশ বামদেবকে জীবিত কুণ্ডের ঘাটে বসিয়ে দিলেন। বামদেব জলে শরীর ডুবিয়ে খুশী। তিনি ক্ষিতীশকে জানালেন, স্নান করতে সময় লাগবে, তাঁর থাকার প্রয়োজন নেই।

ক্ষিতীশ চালা ঘরে ফিরে এলে স্ত্রী মনোরমা বললেন—কী কাণ্ড! বাবাকে একলা ফেলে চলে এলে?

তিনি যে তাই বললেন।

—বললেন তো কী হয়েছে। যাও যাও ছ্যাখো গে কী কাণ্ড করে বসে আছেন।

মনোরমা এমনভাবে বললেন যেন বামদেব তাঁর দামাল ছেলে।

ক্ষিতীশ জীবিত কুণ্ডে গিয়ে দেখেন, সত্যিই এক কাণ্ড। বামদেব কুণ্ডে বা তার আশপাশ নেই।

খোঁজাখুঁজি করতে বামদেবকে শিমূলতলায় পাওয়া গেল। মনোরমা অভিমানের গলায় বললেন—এ আপনার ভারী অন্যায়। যদি পড়ে টড়ে যেতেন।

—না রে বেটি। বামদেব রহস্যের হাসি হাসলেন—মনের জোর তেমন থাকলে কেউ পড়ে না।

*　　　*　　　*

কাল বোশেখীর ঝড় উঠেছে। বাতাস যেন শত হাতে বৃক্ষদের আঘাত করে। শ্মশানের বুড়ো আমগাছটা মড়মড়ি পড়ে গেল। গাছের ডালে কাকের বাসা ছিল, সেটা তছনছ হয়ে গেছে। শাবকদের বাঁচবার আশা নেই।

এই দৃশ্য দেখে বামদেব গান ধরলেন—'মরিব আর অমনি যাইব ব্রহ্মে মিশায়ে তারার চরণে লুটায়ে শিমুলতলায় লুকায়ে।...'

সাধকের সেবায় মনোরমা রয়েছেন। গান শুনে তাঁর নারী-হৃদয় মথিত করে কান্না আসে। তিনি আপ্রাণ চেষ্টায় নিজেকে সংযত করেন তবু চোখের জল পড়ে।

সারারাত মনোরমা ঘুমোতে পারলেন না। বিগত সাত বছরে যত স্মৃতি জমা পড়েছে হিয়াঘরে, সব চোখের সামনে ভাসছে। শিমুল তলায় ধ্যানরত বামদেব, কালু ভুলু পরিবৃত বামদেব, ভক্তদের সাথে পরিহাস রত বামদেব, করুণাঘন সর্বত্যাগী দিগম্বর বামদেব! কত দৃশ্য কত কথা। মনোরমা কাক ভোরে উঠেই বামদেবকে দর্শন করতে এলেন। আজ অনেকক্ষণ থাকবেন বামদেবের কাছে।

দুপুরবেলা এক পাগল এল শিমুল তলায়। সে উত্তেজিত ভাবে বামদেবকে গালিগালাজ করে, মালার মার দিকে তাকিয়ে ফ্যাক ফ্যাক করে হাসে, কালুকে মারতে যায়। নানাভাবে সকলকে উত্যক্ত করে। উন্মাদ বামদেবকে বলল—আর কেন?

মনোরমা বামদেবকে জিজ্ঞেস করলেন—লোকটা কে?

—সাধন ভ্রষ্ট উন্মাদ। বামদেব গভীর গলায় বললেন—ভোগ যোগ এক সঙ্গে করতে গিয়ে সব গেছে। ভোগও হল না যোগও হল না।

উন্মাদ কানখাড়া করে শুনল। তারপর অরণ্যের গভীরে চলে গেল।

*　　　*　　　*

দোসরা শ্রাবণ তারাপীঠে এমন বৃষ্টি নামল যে, পঞ্চমুণ্ডির আসন বুঝি ধুয়ে মুছে যায়।

বামদেব আটচালায় আসন করে বসলেন। সুস্থির ভক্ত নগেন বাগচিকে ডেকে বললেন—মোক্ষদানন্দ বাবার সামাজের কাছে আমাকে উত্তর মুখ করে বসিয়ে সমাজ দিস।

বলে বামদেব ধ্যানে বসলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরে সমাধি হল। ভক্ত নরনারী এবং সারমেয় দল তাঁকে ঘিরে থাকে। কারও মুখে শব্দ নেই।

মন্দিরে সন্ধ্যারতির শাঁখ ঘণ্টা বাজল। বামদেব তিনবার জয়ধ্বনি করলেন—জয় তারা, জয় তারা, জয় তারা, নাসারন্ধ্র দিয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত পড়ল, তারপর সব শেষ।

সমাপ্ত